ঘরবাঁধ

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

দুই টাকা

চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৫৯

এই বই সম্বন্ধে—

মাতৃভূমি—(ফাল্গুন ১৩৫১)···পরলোকগত শরৎচন্দ্রের মত মনোজবাবুও বাংলার মাটির অকৃত্রিম সৃষ্টি। বাংলার পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ, যোগসূত্র নিবিড়। বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে রচিত তাঁর সাহিত্য তাই বাঙ্গালী মনকে এমন ভাবে নাড়া দিয়ে যায়। বাংলার শ্যামল-শ্রীর মত তাঁর রচনার শান্ত মাধুর্য অতি সহজে আমাদের হৃদয় আকৃষ্ট করে।

লেখকের অন্যান্য পুস্তকের মত 'নরবাঁধে'ও তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর সন্ধান পাই।···এর পটভূমিকা বেশ বড়। মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্বেও বাংলার গ্রামের যে ঐশ্বর্য ও শান্তির কথা আমরা শুনি, ধীরে ধীরে কি ভাবে তার মৃত্যু হয়ে, বাংলার গ্রাম বর্তমানের দুর্দশাক্লিষ্ট অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, লেখক তারই পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। যন্ত্র-যুগের অগ্রগতির সঙ্গে গ্রামবাসীরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি—অথচ তার প্রভাবকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি! এই প্রধান উপপাদ্যের সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন পল্লীজীবনের হিংসা ও কুশ্রীতায় বিষাক্ত পারিপার্শ্বিকের চিত্র। অথচ তাঁর লেখা পড়ে কোথাও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না—বরং অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণের অসহায়তায় হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এইখানেই লেখকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সংবেদনশীল দৃষ্টির সামনে বাংলার পল্লী-জীবনের বহিরাবরণ খুলে পড়েছে। বাংলার পল্লীজীবন উন্নত হোক—আশাবাদী লেখকের এ অভীপ্সা যেন গল্পটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।···প্রতিটি চরিত্র সাক্ষ্য দেয় যে মনোজবাবু জীবন সম্বন্ধে গল্প লেখেন, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ এবং নিবিড়। যে অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার থেকে বড় সাহিত্যের সৃষ্টি, তার অপ্রাচুর্য নেই কোথাও। প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত—তারা যেন আমাদের চোখের সামনেই কথা বলে; বাংলার পল্লীজীবনের বিভিন্ন সমস্যা—তার অন্তর্নিহিত মাধুর্য এবং বহিরাবরণের কুশ্রীতা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হয়ে উঠি।

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

······একালের আরেকজন শক্তিমান কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—তাঁহার 'মাথুর' নামক বড় গল্পটিতে এই বাল্য-প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন বাস্তব অনুযায়ী, তেমনই কাব্যরসে সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমাণ্টিক ট্রাজেডী এখানে বাস্তব জীবনেই সেই বৈষ্ণব ভাব-সম্মেলনের অপরূপ কমেডিতে পরিণত হইয়াছে। সে যেমন মধুর, তেমনই নির্ম্মল। কোন ভয় নাই, অকল্যাণের অভিশাপ নাই।···বস্তুত বাংলা-সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরেকটির নাম 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবী করিতে পারেন।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার (বঙ্গদর্শন)

১

ছোটকাকার বিয়ের বরযাত্রী হইয়া চলিয়াছিলাম। তিন ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া কানাইডাঙার ঘাটে নৌকা চাপিতে হইবে।

সে আজিকার কথা নয়, তখন বয়স আমার নয় কি দশ। এই উপলক্ষে বেগুনি রঙের ছিটের জামা এবং একজোড়া মোজা জুতা কেনা হইয়াছে। সেই নূতন জামা গায়ে দিয়া অতি সন্তর্পণে পথ চলিতেছি, ধূলা না লাগে। আর আর ছেলেরা যাইতেছিল, তাহাদের বেগুনি জামা নাই, অনুকম্পার সহিত মাঝে মাঝে তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিতেছি। মেঠো পথে খারাপ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় জুতাজোড়া পরিতে মন সরে নাই, খবরের কাগজে জড়াইয়া বগলে লইয়াছি। বরের পাল্কি ও বাজনদার আগে-আগে চলিয়া গিয়াছে, পিছনে পড়িয়া আমরা। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। ডোঙাঘাটা ছাড়াইলাম, তারপর সাগরদত্তকাটি গ্রামের খেজুর বন, তারপর ভাঙা মসজিদ, সারি সারি তিনটা তেঁতুলগাছ, শেষে কুমোর-পাড়ার বড় বাঁশবাগানটা পার হইয়া একেবারে ফাঁকা বিলের মধ্যে।

ধানের সময়। ধান বন ওপারের গাছপালার গোড়া অবধি চলিয়া গিয়াছে, ধানের গোছায় কোনখানে বিলের জল দেখিবার উপায় নাই। আর দেখিলাম, তেপান্তর ভেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি সারবন্দি চলিয়া গিয়াছে বড় বড় শিরিষ গাছ। বিলের মধ্যে অমন করিয়া গাছ পুঁতিয়া রাখিয়াছে কে? বড় আশ্চর্য লাগিল।

দ্বারিক দত্ত গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, বুড়া লাঠি ঠক-ঠক করিয়া পাশে পাশে যাইতেছিলেন। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন—শুধু কি গাছ? এইটুকু এগিয়ে আয়—দেখবি কত্তো বড় রাস্তা। বল্লভ রায়ের নাম শুনিস নি?

নামটা বরাবরই শুনিয়া থাকি, সেই রাস্তার উপর দিয়া তবে আজ যাইতে হইবে।

রাস্তার উপর গিয়া যখন উঠিলাম, বিস্তার দেখিয়া সত্যসত্যই তাক লাগিয়া গেল! দত্ত-বুড়াকে পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতে ছিলাম, কিন্তু দেখি হাতের লাঠিটা ফেলিয়া একটা শিরিষগাছের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া ইতিমধ্যেই তিনি ভাবে গদ-গদ হইয়াছেন। বলিতে লাগিলেন—দেখেছ ভায়ারা, লক্ষ্মী-ঠাকরুণের দয়াটা একবার দেখ। মরি মরি—যেন দুহাতে ঢেলেছেন!…এই পুঁটিমারির বিলে আমার লাখেরাজ ছিল আড়াই বিঘে। সে কি আজকের?—রূপচাঁদ রায়ের দত্ত দেবোত্তর। নিবারণ চক্কোত্তি ডাহা ফাঁকি দিয়ে নিলে! ওর ভাল হবে কখনো?

মন্মথচরণ কহিল—আবার বসে পড়লেন কেন দত্ত মশায়? চলুন —চলুন—জায়গা খারাপ, আঁধার না হতে এইটুকু পার হতে হবে।

দত্ত মহাশয় আঙুল দিয়া আর একটা গাছের গোড়া নির্দেশ করিয়া কহিলেন—ও মন্মথ, তুমিও একটুখানি বসে নাও না। ছোট ছোট ছেলেপিলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, না জিরিয়ে নিলে ওদের হাঁপ ধরে যাবে যে!

বলিয়া বুড়া নিজেই প্রবল বেগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলে সমস্বরে না—না—করিয়া দত্তের প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিল।

সে কি করে হবে? নর-বাঁধ পার না হয়ে বসাবসি নেই। লাখ টাকা দিলেও রাত্তিরবেলা অশ্বত্থতলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন মশাইরা সব—তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি—আরো।

ফলে উল্টা উৎপত্তি হইল। বিশ্রাম তো পড়িয়া মরুক। ইহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল, তাহাকে হাঁটিয়া যাওয়া কোনক্রমে বলা চলে না। ছোট বড় গুণতি করিয়া আমাদের দলে বরযাত্রী জন চল্লিশের কম হইবে না। এবার একা দ্বারিক দত্ত নয়, সকলেই দস্তুরমতো হাঁপাইতে লাগিল।

হরি জেঠা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন—শিবু, আর একটু—উই যে সামনে মস্ত উঁচু-মাথা অশ্বত্থগাছ—ঐ-ঐ—ঐখানে। নর-বাঁধটা পার হয়ে তারপর আস্তে-আস্তে চলব।

আমার কান্না পাইতেছিল। বলিলাম—আর কতদূর?

জেঠা বলিলেন—কানাইডাঙা? পথ আর বেশি নেই, নর-বাঁধের পর বাঁয়ে একটা ভাঙাড়—সেইটা দিয়ে রসিটাক এগুলে গাঙ পড়বে।

সন্ধ্যার আগেই বড় একটা খালের ধারে পৌঁছান গেল। জেঠা বলিলেন—এই নর-বাঁধ। এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখি, বাঁধের চিহ্ন কোন দিকে কিছু নাই, কেবল খালটি মাত্র। লাখ টাকা দিলেও রাত্রিবেলা যে অশ্বত্থতলা দিয়া এই চল্লিশটা মানুষ একসঙ্গে যাইতে স্বীকার করিবে না, সেই গাছটি দেখিলাম। কেন যে সকলের এত ভয়, ডালপালা-মেলা সুপ্রাচীন গাছের চেহারা দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। আমার তো সেই দিনের বেলাতেই গা ছম-ছম করিতে লাগিল।

সকলে কাপড়-জামা খুলিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া লইল। আমি হরি জেঠার কাঁধে চড়িলাম এবং আমার কাঁধে কাগজে-মোড়া সেই নূতন জুতাজোড়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—জেঠা বাঁধ কই?

দুইধারে বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহার মধ্য দিয়া জল ভাঙিয়া সকলে চলিয়াছে! সেই বাঁশ দেখাইয়া জেঠা কহিলেন—বাঁধ ভেসে গেছে

বর্ষার টানে, বাঁশগুলো আছে। আবার মাঘ মাসে জল কমলে চাষীরা নতুন করে বেঁধে দেবে—

কে একজন পিছনে আসিতেছিল, তাহার নামটা মনে নাই, কহিল—চাষা বেটাদের বুদ্ধি দেখ না—ফি বছর এই রকম গতর ঘামিয়ে পয়সা খরচ করে বাঁধ বাঁধবে,—তার চেয়ে একবার এক পাঁজা ইট পুড়িয়ে যদি দুইধার পাকা করে বেঁধে দেয়—ব্যস!

দ্বারিক দত্ত কোথায় ছিলেন, হঠাৎ দেখি জলের মধ্যে লাঠি খোঁচাইতে খোঁচাইতে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন—কি বললেন, পাকা ইটের গাঁথনি হলেই বাঁধ টিকে থাকবে? সে আর হতে হয় না। বল্লভ রায়ের টাকা তো কম ছিল না বাপু—পারলে না কেন? টাকায় এসব হয় না। এক টা নরবলি দিয়ে এইটুকু চাপা পড়েছে—সহস্র নরবলি হলে তবে যদি মা কালী খুশি হয়ে খাল ভরাট করে দেন—

ভয়ে সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এইখানে মানুষ বলি হইয়াছিল নাকি? আবার হয়তো অনাগত দিবসে কে কবে আসিয়া সহস্র বলি দিয়া আগাগোড়া খাল ভরাট করিয়া দিবে! জল বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে হরি জেঠার বুক অবধি ডুবাইয়া গেল। আমি চুপটি করিয়া কাঁধের উপর বসিয়া আছি। দ্বারিক দত্তর উদ্দেশে প্রশ্ন করিলাম—ও বুড়ো দাদা, এখানে নরবলি হয়েছিল নাকি?

দ্বারিক দত্ত উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরি জেঠার বোধ করি মনে-মনে ভয় হইয়াছিল। বিরক্তভাবে প্রসঙ্গ থামাইয়া দিলেন—বক-বক কোরো না শিবু, শক্ত করে ধরে বোসো—

তখন হইল না, কিন্তু সেই দিনই রাত্রিবেলা গল্পটা শুনিয়াছিলাম। পানসিতে উঠিয়া বরযাত্রিদলের ভয় কাটিয়া মুখ আবার প্রসন্ন হইল। দুই জোড়া পাশা পড়িল এবং তাহার উৎসাহ ও চিৎকার

উদ্দাম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নদীর বুক কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। কেবল দ্বারিক দত্ত মহাশয় দল-ছাড়া; পাশাখেলা জানেন না—বৃথাই চুল পাকাইয়াছেন। একাকী গলুয়ের উপর বসিয়াছিলেন। আমি কাছে গিয়া চুপ-চুপি বলিলাম—বুড়ো দাদা, গল্প বলো।

—গল্প? কিসের গল্প শুনবি?

বলিলাম—ঐ নব-বাঁধের—

হাতে কাজ নাই,—দ্বারিক দত্ত তখনই প্রস্তুত। আরম্ভ করিলেন—তবে শোন্—

পুঁটিমারির বিল হইতে ক্রোশ সাতেক দক্ষিণে এখন যেখানটা ভদ্রা নদী গ্রাস করিয়াছে, কতকগুলি অনেক কালের বড় বড় ঝাউগাছ নদী-তীর আঁধার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐখানে বল্লভ রায় মহাশয়ের বাড়ি ছিল। ঢাকার নবাব-সরকারে চাকরি করিতেন, নবাবের ভারি বিশ্বাস তাঁহার উপর। দেউড়ির কাছে একখানা প্রকাণ্ড সেগুনকাঠ পড়িয়াছিল, তেমন কাঠ আজকালকার দিনে ভূ-ভারতে কোথাও হয় না। বল্লভ একদিন কাঠখানা চাহিয়া বসিলেন।

নবাব ঐপথে সর্বদা আসিতেন যাইতেন। কিন্তু নবাব-বাদশার তো নিচের দিকে তাকাইবার নিয়ম নাই, কাজেই খেয়াল ছিল না। প্রশ্ন করিলেন—কিসের কাঠ? কত বড়?

বল্লভ দুই হাত আন্দাজি আয়তন দেখাইলেন এবং বলিলেন—দেশে গিয়ে একখানা কুঁড়ে বাঁধবার ইচ্ছে করছি, সেই জন্য।

হুকুম হইয়া গেল। নবাবের বারো হাতী লাগাইয়া তবে সেই কাঠ গাঙে নামাইতে হয়। তারপর বড় ভাউলের সঙ্গে বাঁধিয়া ভাসাইয়া আনা হইয়াছিল। ঐ এক কাঠে বল্লভের তিন মহল বাড়ির

কড়ি-বরগা হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা রায় মহাশয়ের বড় অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারা খুব গোপনে আর একটা কথা বলিতেন—বল্লভ নাকি বাযট্টিখানা সোনার ইট নবাবের তোষাখানা হইতে সরাইয়া ঐ ভাউলের খোলে পুরিয়া বাড়ি আনিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা সেই স্বর্গীয়েরাই জানিতেন, কিন্তু ইহার পর বল্লভ রায় আর ঢাকায় ফিরিয়া যান নাই।

ভদ্রার উভয় কূল দিয়া একেবারে ভৈরব অবধি জায়গা-জমি কিনিয়া ও কাড়িয়া-কুড়িয়া তিনি রাজ্য করিতে লাগিলেন। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মাহিনা-করা ঢালির দল ঢাল-সড়কি লইয়া পাহারা দিত। সেই দলের সর্দারের নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয় দাস। অমন খেলোয়া আর হয় না। এখনো এ অঞ্চলের লাঠিয়ালেরা লাঠি ধরিবার আগে মৃত্যুঞ্জয়ের নামে মাটি হইতে ধূলা তুলিয়া মাথায় ও কপালে মাখিয়া থাকে।

শোনা যায়, মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি ছিল পূব অঞ্চলে পদ্মাপারে। যৌবনে খুন ডাকাতি দাঙ্গা করিয়া খুব নাম কিনিয়াছিল, তারপর বয়স ভারি হইলে নিজেই ডাকাতের দল গড়িল। কিন্তু বউ মরিয়া যাইবার পর যেন কি হইল। আঁতুড়-ঘরে বউ মরিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচিয়া উঠিল—ক্রমে সে বছর পাঁচেকের হইল, সকলে কুড়োন বলিয়া ডাকিত। সেই কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় শান্ত ভালোমানুষ হইয়া ঘর পাতিল। বড় ছেলের নাম যাদব, তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু যাদবের নূতন বয়স, রক্ত গরম—বাপের কথা শুনিল না, দলে রহিয়া গেল।

কিন্তু ঘর করা কপালে ঘটে নাই।

বয়সকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা সাধিয়া আসিয়াছে এখন জো পাইয়া একদিন রাত্রে তাহারা চার-পাঁচশ লোকে বাড়ি ঘিরিয়া

ফেলিল। জাগিয়া উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় দেখে, মশালের আলোকে চারিদিক আলো-আলোময়। যেন সিংহের বিক্রম বুকের মধ্যে আসিল। কুড়োনকে কাঁধে করিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ব্যূহ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল, এতগুলি নরদের মধ্যে কাহারও এমন সাধ্য হইল না যে একটা হাত উঁচু করিয়া তোলে।

তারপর দেশ ছাড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িল বল্লভের সীমানার মধ্যে। বল্লভের তখন রাজ্যপত্তনের মুখ, এমন গুণীলোক পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

মৃত্যুঞ্জয়কে করিতে চাহেন ঢালি-দলের সর্দার। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়, বলে—না রায় মশায়, এসব আর নয়। জীবন নিয়ে খেলা আর করব না—বউ মরবার সময় কিরে করেছি।

বল্লভ নাছোড়বান্দা। বলিলেন—দাঙ্গা-ফ্যাসাদে কোনদিন তোমায় পাঠাব না, তুমি কেবল আমার ঢালিদের খেলা শিখিও।

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় রাজি না হইয়া পারিল না, বলিল—বেশ, তাই হল। তোমার নুন যখন খাব, তোমার জন্য জীবন দিতে পারব—কিন্তু কারো জীবন কখনো নেব না, এই চুক্তি।

তারপর কত বড় বড় দাঙ্গা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় সে সবের মধ্যে না যাইয়া পারে নাই। কিন্তু এমন আশ্চর্য কায়দায় লাঠি চালাইত যে তাহার হাতে আর একটা লোকও মরে নাই।

এ সব যে আগলের কথা তখন বল্লভের চুলে পাক ধরিয়াছে, তাঁহার মায়ের বয়স আশির উপর। গঙ্গাহীন দেশ—চাকদার এদিকে আর গঙ্গা নাই। মরণকালে বুড়া মায়ের গঙ্গালাভ হইবে না, এই আশঙ্কায় শেষের ক'টা দিনের জন্য মাকে চাকদায় পাঠান ঠিক হইল। রায় মহাশয়ের মা যাইতেছেন, সহজ কথা নয়—লাঠিয়াল-পাইক সাজিল,

চাল-ডাল-ঘি লইয়া বিস্তর লোকজন আগে আগে ছুটিল, পথের মধ্যে মধ্যে জায়গা পরিষ্কার করিয়া পরম শুদ্ধাচারে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত হইবে। তিন চারি দিনের পথ। ষোল বেহারা হুম-হুম করিয়া বুড়িকে বহিয়া লইয়া চলিল।

জ্যোৎস্না রাত, সাত ক্রোশ বেশ কাটিল—একশ' পাইক জকার দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু সাত ক্রোশের মাথায় গিয়া পড়িল ঐ দুরন্ত খাল। পাড় ভাঙিয়া ডাক ছাড়িয়া দুই পাশের ধানবন দলিয়া মলিয়া হু-হু বেগে খাল ছুটিতেছে, টানের মুখে কুটাটি ফেলিলে দুই খণ্ড হইয়া যায়। জলে নামিয়া খাল পার হইবে কাহার সাধ্য ?

পাল্কি নামাইয়া সমস্ত রাত সেই খালের পাড়ে বসিয়া। তারপর সকালে অনেক কষ্টে একখানা ডিঙ্গা যোগাড় করিয়া খালে আনিয়া পাল্কি পার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু এত লোকজন বোঠে বাহিয়া গলদ্‌ঘর্ম, ডিঙা কিছুতে খালে ঢুকিল না। দুইদিন সেখানে সেই অবস্থায় কাটাইয়া অবশেষে সকলে ফিরিয়া আসিল।

মা ফিরিয়াছেন শুনিয়া বল্লভ সকল কাজকর্ম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু মা কথা কহিলেন না। এত কান্নাকাটি, কিছুতেই না। তারপর অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে কান্না—সে কি ভয়ানক কান্না!—নিজের পোড়া অদৃষ্টের কথা, মরিবার আগে গঙ্গাস্নানটাও হইল না—এই দুঃখ। বল্লভ রায়ের ভারি মনে লাগিল, কঠিন দিব্য করিলেন—তিন মাসের মধ্যে ঐ খাল বাঁধিয়া একেবারে চাকদা পর্যন্ত সোজা রাস্তা তৈয়ারি করিয়া সেই রাস্তায় মাকে নিজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন, তাহা না পারিলে তিনি অব্রাহ্মণ। পরদিন হইতে হাজার লোক কাজে লাগিল। বল্লভ রায়ের ঢালাও হুকুম—খাল বাঁধিয়া চাকদা পর্যন্ত রাস্তা করিতেই হইবে, উহাতে সর্বস্ব খরচ করিয়া পথের ফকির হইতে হয়,

সে-ও স্বীকার। এপারে ওপারে রাস্তা বাঁধিতে বেশি বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু খাল লইয়াই বাধিল যত মুশকিল।

এখন আর খালের কি আছে? দুই কূল মজিয়া বিল হইয়াছে, মাঝখানে ক্ষীণ জলধারা। বর্ষার সময় টান হয়। কিন্তু সে সব দিনের তুলনায় একেবারে কিছুই নয়। বল্লভের লোকজন জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতিয়া খাজ্যের খড় সেই বাঁশের গায়ে বাঁধিয়া জলের বেগ কমাইবার কত চেষ্টা করিতে লাগিল, নৌকার পর নৌকা বোঝাই ইট ও মাটি খালে ঢালিল, কিছুতেই কিছু হয় না, সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। অথচ খাল বাঁধিতে না পারিলে প্রতিজ্ঞা পণ্ড হয়।

তিন মাসের আর তিন দিন বাকি। বল্লভ তো ক্ষেপিয়া গিয়াছেন, দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার—জয় মা চণ্ডিকে, মুখ রাখিস মা—বলিয়া চিৎকার করেন এবং খালের ধারে নিজে থাকিয়া রাতদিন তদারক করিতেছেন। কোন উপায় হইতেছে না। তিন দিনের মধ্যে সুরাহা না হইলে খালের জলে ডুবিয়া মরিবেন, মনে মনে মতলব আছে। সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও বলেন নাই; তবে ভ্রূকুটিময় ভীষণ মুখ দেখিয়া লোকজন মনে করে, ঝড় আসন্ন।

সে দিন গভীর রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আকাশ-ভরা মেঘ। বল্লভের চোখে ঘুম নাই, তাঁবু হইতে বাহির হইয়া একাকী নূতন-বাঁধা রাস্তায় পায়চারি করিতেছেন। এত অন্ধকার যে কোলের মানুষ দেখা যায় না। এমন সময় হু-হু করিয়া হাওয়া বহিয়া গেল। চারিদিকে প্রকাণ্ড বিল, ডাকভরের মধ্যে মানুষের বসতি নাই। এত বড় সাহসী মানুষ, তবু বল্লভের গা'টা ছম-ছম করিয়া উঠিল; ফিরিয়া তাঁবুতে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং আশ্চর্য ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল।

স্বপ্নে দেখিলেন, সশরীরে দেবী চণ্ডিকা—সে কথা বলিতে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে,—একেবারে সত্যসত্যই কালীমূর্তি! তিনি যেন হাতের খাঁড়া নাড়াইয়া বল্লভকে ইসারা করিলেন, বল্লভ পিছু পিছু খাল-ধার অবধি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দেবী দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেলেন। হঠাৎ ঝপ্‌পাস শব্দে কি-একটা খালে পড়িল, জল ছিটকাইয়া উঠিল। বল্লভ দেখিলেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, একটা কবন্ধ দেহ জলের টানে একবার ভাসিয়া উঠিয়া পলকের মধ্যে তলাইয়া গেল, আর তাঁহার চোখের সামনে শূন্যে নিরালম্ব ঝুলিতেছে মুণ্ডটি। বড় বড় চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গলা দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া খালের জল লাল হইয়া গেল। মুণ্ডটার দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেই যেন চিনিতে পারিবেন, কিন্তু চাহিতে পারিতেছেন না। এমন সময় সর্বাঙ্গে অননুভূতপূর্ব কম্পন জাগিয়া উঠিল, বল্লভের ঘুম ভাঙিল। আগাগোড়া ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া তখনই গিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ডাক দিলেন—মৃত্যুঞ্জয়, ও মৃত্যুঞ্জয়!

কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় খালের ধারে মাদুর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। বাপে-বেটায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ইসারা করিয়া বল্লভ তাঁবুতে ডাকিলেন। আবার ইসারা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একা একাই আসিতে বলিলেন—কুড়োন ওখানে থাকুক, বড় গোপন ব্যাপার। ছেলেকে বসাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে দু-জনে অগ্রসর হইল। আট-দশ পা আসিয়াছে —এমন সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের পিছনের কাপড়ে টান, তাকাইয়া দেখে কুড়োন আসিয়া কাপড় ধরিয়াছে। বল্লভ ফিরিয়া চাহিলেন, আবার বাঁ-হাত নাড়িয়া উহাকে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। মৃত্যুঞ্জয় জোর করিয়া কাপড় ছাড়াইয়া লইল তো কুড়োন বাপের হাত জড়াইয়া ধরিল।

অন্ধকারে ভয় করিতেছে, সে কিছুতেই বাপকে ছাড়িবে না। মৃত্যুঞ্জয় ধমক দিল, মিষ্ট কথায় বুঝাইল, কিন্তু তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আঁধার অশ্বত্থগাছের কাছে বালক কিছুতেই বসিয়া থাকিবে না। অগত্যা কুড়োনকেই তাঁবুর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া দু-জনে খালের ধারে বসিয়া পরামর্শ হইতে লাগিল।

কিছুই সাব্যস্ত হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের সেই এক কথা—আমি জীবন দিতে পারি রায় মশায়, জীবন নিতে পারব না—সে তো তুমি জান। তোমার হুকুম মানি কি করে ?

বল্লভ কহিলেন—আমার হুকুম নয়, চণ্ডীর হুকুম। স্বপ্নে আমায় স্পষ্ট দেখিয়ে দিল—নররক্ত না খেয়ে বেটি কিছুতেই খাল বাঁধতে দেবে না—

মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রকাণ্ড বুকের উপর থাবা মারিয়া বলিল—আমাকেই তবে বলি দাও। তোমাদের নুন খেয়েছি, তাতে পিছপাও নই। কুড়োন থাকবে, তাকে তুমি দেখো।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। বল্লভ শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, জানেন যে ইহা অব্যর্থ। বলিলেন—তোমার দরকার হবে না মৃত্যুঞ্জয়, আমি আছি। সে সব মনে মনে আমার ঠিক করাই আছে। তুমি একবার খোঁজাখুঁজি করে দেখে এসো—হোক না হোক পরশু রাত পোহাবার আগে ফেরা চাই। নর-বলির ভাবনা কি ? বলিয়া আরও গম্ভীর হইলেন।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দাঁড়াইয়াও কি ভাবিতে লাগিল।

বল্লভ বলিলেন—নাস্তিকের মতো কথা বল কেন ? জীবন নেওয়া তুমি বল কাকে ? মায়ের পূজোর বলি জোগাড় করে আনা আর মানুষ খুন করা এক কথা হল ? ছি—ছি—ছি—

সেই টানিয়া-টানিয়া বলা ছি-ছি-ছি মৃত্যুঞ্জয়কে যেন তিনবার মুগুর মারিল। মনিবের হুকুমের পর আর কোনদিন সে দ্বিরুক্তি করে নাই। কহিল—আমি মুখ্যু মানুষ, ধর্ম-অধর্ম বুঝিনে। তুমি বল্লে রায় মশায়, দোষ হয় না—আমি চললাম। কুড়োন রইল তোমার তাঁবুতে, বড় ভীতু,—ওকে দেখো—

দীর্ঘমূর্তি অন্ধকারে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় অদৃশ্য হইল। বল্লভ তাঁবুর মধ্যে ঢুকিলেন। দেখিলেন, আলগা খড়ের উপর বল্লভের বিছানার পাশে কুড়োন বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে।···

মাঝে একটা দিন-রাত্রি, তারপর আরো একটা দিন কাটিয়া রাত্রি আসিল। শেষের রাত্রি! কাল সন্ধ্যার সময় ঠিক তিন মাস পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিজ্ঞা পণ্ড হইয়া গেলে তাহার পর খাল বাঁধা না বাঁধা একই কথা। এই রাত্রির মধ্যেই ক্ষুধিত করালীর বলি চাই, নর-রক্তে খালের জল লাল হইলে তবে জলের বেগ কমিবে।

বল্লভ জানেন, একেবারে নিশ্চিত আছেন—যেমন করিয়া হোক, মৃত্যুঞ্জয় রাত্রির মধ্যে বলি লইয়া ফিরিয়া আসিবেই। সন্ধ্যার আগে সমস্ত লোকজন বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা পাঁচক্রোশ দূরের গ্রামে চলিয়া গেল। নরবলির কথা ঘুণাক্ষরে কেহ জানে না। বাহিরে কেবলমাত্র প্রকাশ, কার্যসিদ্ধির জন্য রায় মহাশয় ভয়ঙ্কর কালী-সাধনা করিতেছেন। আজ তার পূর্ণাহুতি।

পরম সৌভাগ্যবান উৎসর্গিত বলির মানুষটি যখন আর্তনাদ করিবে সে কণ্ঠ দেবতা ছাড়া যাহাতে বাহিরের কানে না পৌছায়—বল্লভ সর্বরকমে তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সামান্য একটা খুঁত রহিয়া

গেল—সে কুড়োন। কত লোভ দেখান হইল, কত বুঝান হইল—সে কিছুতেই গ্রামে গেল না। তাহার ভয় করে, আর কোথাও গিয়া থাকিতে পারে না। হতভাগা ছেলে চিনিয়া রাখিয়াছে কেবল বাবাকে আর রায় মহাশয়কে। দুইদিন বাবাকে দেখে নাই, ভারি মন কেমন করে, গোপনে গোপনে খুব কাঁদিয়া থাকে—কিন্তু বল্লভকে দেখিলে চোখ মুছিয়া হাসে, তাঁর সামনে কান্নাকাটি করা বড় লজ্জার ব্যাপার বলিয়া মনে করে।

কুড়োন তাই রহিয়া গিয়াছে। তা ঐ বালকের জন্য ভাবনা কিছু নাই। একবার ঘুমাইয়া পড়িলে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তার ঘুম ভাঙানো যায় না। নিশি-রাত্রির ব্যাপার সে জানিতে পারিবে না।

প্রহরের পর প্রহর নিঃশব্দে কাটিয়া যাইতেছে, মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না। কুড়োন ঘুমাইয়া পড়িলে বল্লভ অনেকক্ষণ ধরিয়া নূতন হাঁড়িতে ঘসিয়া ঘসিয়া খড়্গ শানাইয়াছেন, অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে রক্ত-লোলুপ সেই শাণিতাস্ত্র ঝকমক করিতেছে। ক'দিন রাত্রির পর রাত্র জাগিয়া চক্ষু আগুনের ভাঁটার মতো লাল। আজ আবার রক্তবর্ণের চেলি পরিয়াছেন, কপালে বাহুতে বড় বড় সিঁদুরে ফোঁটা। বাতাসে এক একবার ধানবন কাঁপিয়া উঠে, অশ্বত্থগাছের দু-চারিটা পাতা উড়িয়া তাঁবুর কাছে পড়ে, অমান কাঁধের উপর খড়্গ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। শেষে আর তাঁবুর মধ্যে তিষ্ঠাইতে পারিলেন না, খড়্গ কাঁধে বাহিরে আসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, ভয়ঙ্কর অন্ধকার। কোনখান হইতে খালের আরম্ভ বুঝিবার উপায় নাই। জল-স্থল একাকার হইয়া গিয়াছে। বাতাসও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গাছের পাতাটি নড়ে না। বল্লভের মনে হইল, বুঝি এইমাত্র মহাপ্রলয় হইয়া গেল, শব্দময় প্রাণপ্রবাহ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, জীবজগৎ নাই, জন্ম-মৃত্যু সমস্তই একাকার,...তিনিও এইবার

নিশ্বাস বন্ধ হইয়া পড়িয়া যাইবেন। নিঃশব্দতা পাথর হইয়া বুক চাপিয়া রহিয়াছে, প্রতি মুহূর্তেই চাপ বাড়িতেছে। অসহ্য মনে হইল। চিৎকার করিয়া উঠিলেন- জয় মা চণ্ডীকে! সেই চিৎকারে নিজেরই সবদেহ শিহরিয়া উঠিল। দেবী চণ্ডী উপবাসী ;—বল্লভের মনে হইল রক্ত-বুভুক্ষু মুণ্ডমালিনী তাঁর ঠিক সামনেই অতল অন্ধকারের মধ্যে কৃপাণ মেলিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছেন। মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া উঠিল। মনে হইল, অশ্বত্থগাছের তলা হইতে দ্রুতপদে কাহারা বাহির হইয়া আসিতেছে—এক—দুই—তিন—চার—···অনন্ত! ডাকি-লেন—কে? কারা? উত্তর নাই। খুব জোরে আবার ডাকিলেন —কে? কে? কে? গাছের তলায় গিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক হাতে শক্ত মুঠায় খড়্গ ধরিয়া আর এক হাত বাড়াইয়া অসমান গুঁড়ির চারিদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। উপরে তাকাইয়া দেখিলেন। বোধ হইল, ডালপালার ভিতরে প্রকাণ্ড ঢালের মতো একটা লেলিহান জিহ্বা লকলক করিয়া দুলিতেছে এবং জিহ্বার দুই পাশ দিয়া দেহহীন, চক্ষুর আশ্রয়হীন কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টি হাউইবাজির মতো আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার দিকে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। খড়্গ উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখেন, লোহার উপরে যে চক্ষুটি অঙ্কিত ছিল, তাহাও আগুন হইয়া জ্বলিয়া একেবারে চোখাচোখি তাকাইয়া আছে। ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ছুটাছুটিতে মাথার মধ্যে আগুন যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাঁবুর চারিপাশে খালের পাড়ে অশ্বত্থতলার নূতন-বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া বল্লভ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছিন্নমস্তার মতো নিজের মাথা নিজেরই কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। অন্ধকার তরল হইয়া আসিতেছে। পূর্বাকাশে রক্তিমাভা। রাত্রি পোহাইতে আর দেরি নাই। বল্লভ

রায় পাগল হইয়া উঠিলেন। মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না; সে বিশ্বাস-ঘাতক। ঠিক বুঝিলেন, বড় অনিচ্ছার সহিত গিয়াছিল,—এখন চক্রান্ত করিয়া কোন দেশে পলাইয়া বসিয়া আছে। কালবল্লভ সর্ব রকমে অপদস্থ হইলে তারপর হয়তো ফিরিয়া আসিবে। প্রান্তর কাঁপাইয়া প্রবল হুঙ্কার দিলেন—জয় মা চণ্ডিকে! খড়্গ লইয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কুড়োন জাগে নাই, বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছিল, একবার ঘুমাইলে কিছুতে ঘুম ভাঙে না। বল্লভ আর একবার চিৎকার করিলেন—জয় মা!

কুড়োন জাগিল না।

*

ভালো করিয়া ফর্শা না হইতেই মৃত্যুঞ্জয় ফিরিয়া আসিল। দু'দিনে সে অনেক দূর গিয়াছিল, অবশেষে রাত্রিবেলা এক সুকুমার ব্রাহ্মণ-শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরিও করিয়াছিল। মুখ বাঁধিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া ক্রোশ পাঁচ-ছয় ছুটিয়া আসিয়াছে, এমন সময় গুড়-গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল—বিদ্যুৎ চমকাইল। মাঠের মধ্যে তাহার আলো পড়িল বালকের মুখের উপর। চাহিয়া দেখে, ছেলেটি জাগিয়াছে—ভীত-বিহ্বল অসহায় দৃষ্টি, মুখ বাঁধা বলিয়াই শব্দ করিতে পারিতেছে না, এক-একবার গলার মধ্যে ঘড়-ঘড় আওয়াজ উঠিতেছে। কে যেন মৃত্যুঞ্জয়ের পা দুখানা ঐখানে আটকাইয়া ফেলিল। তাকাইয়া তাকাইয়া বারবার ছেলেটির মুখ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, সে যেন কুড়োনের মুখ বাঁধিয়া হাঁড়িকাঠের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। মাঠ পার হইয়াই এক গৃহস্থ-বাড়ি। তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেটিকে নামাইয়া রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া পলাইল। বিল ভাঙিয়া সোজাসুজি দৌড়িয়া আসিয়াছে,

ধানবনের মরমর ধ্বনিতে পিছল পথে অনবরত পিছন হইতে মুখ-বাঁধা বালকের ঘড়ঘড়ানি গলার আওয়াজ শুনিতে শুনিতে আসিয়াছে। খালের ধারে আসিয়া বল্লভকে দেখিতে পাইল। জলের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া তিনি গভীর মনোযোগের সহিত নিচের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বল্লভের সম্বিৎ নাই। দেখিতেছেন—গভীর নিম্নদেশে জমা-রক্তের চাপ গুলিয়া গিয়া ক্রমশ সমস্ত খালের জল রাঙা হইয়া উঠিতেছে, একটু একটু করিয়া জলের বেগ কমিতেছে, এক-একবার মাটির চাঁই জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন—না, আর তেমন আগের মতো পাক খাইয়া মাটি ভাসাইয়া লইয়া যায় না। এইবার—এখনি—আর একটু পরে জল স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। মৃত্যুঞ্জয় অনেকক্ষণ পিছনে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয়ের এ ভাব সে আর কখনও দেখে নাই। ডাকিতে সাহস হইল না। শেষকালে উঠিয়া গিয়া বল্লভের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল। তাঁবুর মধ্যে কুড়োন নাই। এক পাশের অনেকগুলি খড় তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, নিচের শুকনা ঘাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর আশেপাশের খড়ের উপর তাজা রক্তের ছিটা। যে-মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত যৌবনকাল হাতে পায়ে রক্ত মাখিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছে, বুড়ো বয়সে ক'ফোঁটা রক্ত দেখিয়া তাহার সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। বল্লভকে গিয়া বলিল—রায় মশায়, আমার কুড়োন কোথায়?

বল্লভ তার দিকে তাকাইলেন, সে দৃষ্টির কোন অর্থ হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় তাহার হাত ধরিয়া প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়া বলিল—শুনছ? শুনছ? তোমার কাছে রেখে গেছলাম, আমার কুড়োন কোথায় গেল? বলে দাও, সে কোথায় গেল?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেল, এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল না। পরদিন সমস্ত দিনমান কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল কেহ বলিতে পারে না। এদিকে চাটগাঁর দিকে যে কারকুন গিয়াছিল— এমনি দৈবচক্র, সকালবেলাতেই বিস্তর লোক লইয়া সে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার মধ্যেই খাল বাঁধা শেষ।

বল্লভের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি আর শান্তি পাইলেন না।

সেদিন নিশীথরাত্রে বল্লভ জাগিয়া ছিলেন। হঠাৎ সদ্যঃসমাপ্ত বাঁধের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া বল্লভের হাত ধরিয়া আগের দিনের মতো প্রশ্ন করিল—আমার কুড়োন কোথায় গেল? তাকে কোথায় রেখেছ—বলে দাও—বলে দাও।

বল্লভ কেবল হতভম্বের মতো তাকাইয়া দেখিলেন। আবার মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে বল্লভের যে কি হইল, তিনি আর বাড়ি-ঘরে ফিরিলেন না। দিনরাত খালের ধারে তাঁবুর মধ্যে চুপ করিয়া কাটাইতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ছেলে যাদবকে খবর দিয়া আনা হইল। বিস্তর জমিজমা দিয়া তাহাকে বসত করাইলেন। লোকে বলে, মৃত্যুঞ্জয় নাকি প্রতি-রাত্রেই আসিত। দিগন্তবিসারী জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিস্তব্ধ নিশীথে প্রভু-ভৃত্যে কথাবার্তা হইত, বল্লভের কোন কোন কর্মচারী তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিত—রায় মশায়, আমি জীবন দেবো, জীবন নেবো না কখন।

বল্লভ বলিতেন—সে আমি জানি, জানি—তুই কক্ষনো জীবন নিবিনে—

তবু বল্লভ রায়ের জীবন গেল। মাস দেড়েক পরের কথা, পরিষ্কার পূর্ণিমা রাত, ভাদ্রমাসের শেষ কোটাল। বাঁধের গায়ে প্রবল

বেগে জোয়ারের জল ধাক্কা দিতেছে। হঠাৎ তুমুল কলকল্লোল শুনিয়া বল্লভ রায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, বাঁধ ভাঙিয়াছে, হু-হু করিয়া খালের মধ্যে জল ঢুকিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাঁধের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তারপর দেখিলেন, ওপারে জ্যোৎস্নার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এই সময়ে রোজই সে মনিবের কাছে আসিত। বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায় আজ আর তাঁর কাছে আসিতে পারিতেছে না। মৃত্যুঞ্জয় ডাকিতে লাগিল—রায় মশায়, রায় মশায়,—

বল্লভ বলিলেন—কি করে যাই? দেখছিস জলের টান?

সে বলিল—চলে এসো, মোটে হাঁটুজল—। ওপার হইতে মৃত্যুঞ্জয় নামিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল, হাঁটুজলও নয়। এপারে বল্লভ নামিলেন। কিন্তু এপারে জল বেশি, বুকজল ক্রমে গলাজল হইয়া দাঁড়াইল।

বল্লভ ডাকিয়া বলিলেন—তুই এগিয়ে আয় মৃত্যুঞ্জয়, আমি আর পারছিনে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—আর একটু রায় মশায়, আর একটু—এইবার জল কমবে।

জলের টানে ঘুমন্ত অবোধ বালকের চাপা কান্নার মতো শোনা যাইতে লাগিল। মাথার উপর মেঘ-নির্মুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝখানে আসিয়া দু-জনে প্রবল আকর্ষণে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর জোয়ারের বেগে কে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা কেহ জানে না।...

দ্বারিক দত্ত আর কি-কি বলিয়াছিলেন পনের বছর পরে এখন তাহা মনে নাই। তবে এটা মনে পড়ে—সেদিন সন্ধ্যায় ভাঁটা সরিয়া গিয়া ঈষন্নিম্ন সমতল নদীগর্ভ অনেকখানি অনাবৃত হইয়া পড়িয়া

ছিল এবং চাঁদের আলোয় বালুকারাশি চিক-চিক করিতেছিল। গল্প শুনিতে শুনিতে একটু পরেই চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া পড়িলাম, ভয়ে রাতের মধ্যে চোখ আর মেলি নাই।

পরদিন গোধূলি-লগ্নে নির্বিঘ্নে ছোট কাকার বিবাহ হইয়াছিল, বরযাত্রীরাও আকণ্ঠ মিষ্টান্ন ভর্তি করিয়াছিলেন। সেই ছোট কাকী এখন পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা। দেখিতে দেখিতে পনেরটা বছর কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শেষের বছর দশেক আমরা একদম দেশছাড়া। বাড়িসুদ্ধ সকলে কাশীতে আছি—সেখানে বাবা কাঠের ব্যবসা দিব্য জমাইয়া বসিয়াছেন। অবস্থা ফিরিয়াছে। কেবল ফি বছর বাবা স্বয়ং একবার করিয়া দেশে যান। স্বদেশপ্রেম বশত নয়। পুঁটিমারির বিলে সুবিধামতো অনেক জায়গা-জমি কেনা হইয়াছে বলিয়া। যদিও দক্ষ নায়েব একজন আছে, তবু নিজে গিয়া এক-একবার দেখিয়া আসিতে হয়।

এদিকে আমি আইন পাশ করিয়া একরকম নিরুপদ্রব হইয়া আবার কাশীর বাড়িতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। বাবা জানেন, আমিও জানি—ঐ পাশের বেশি আমার দ্বারা আর কিছু হইবে না। সুতরাং কোর্টে যাইবার জন্য কোন পীড়াপীড়ি নাই। যে দিন বীণার সঙ্গে ঝগড়া হইয়া যায়, ভারি রাগ করিয়া গায়ের উপর চোগা-চাপকান চাপাইতে লাগিয়া যাই—আবার হাসিয়া যখন সে দুয়ার আটকাইয়া দাঁড়ায়, ঐ বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া পড়ি।

এমনি চলিতেছিল। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ বাবা ডাকিয়া বলিলেন—একবার দেশে যাও, কাল-পরশুর মধ্যে—

অবাক হইয়া গেলাম। দশ বছরের অভ্যাসক্রমে বাংলা-মুলুকের সেই সুদুর্গম গ্রামটি মন হইতে ক্রমাগত দূরে সরিতে সরিতে প্রায়

আন্দামান দ্বীপের সমান তফাৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাপ হইয়া এমন বিভ্রাট বাধাইতে চান কেন!

কহিলাম—কেন, আপনি?

বাবা কহিলেন—আমি হপ্তাখানেকের মতো নাগপুরে যাচ্ছি কাঠের চালান আনতে। সে তো তুমি পারবে না!

না, তাহাও পারিব না। অতএব চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা বলিতে লাগিলেন—পুঁটিমারির জমি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধে উঠেছে—ঘনশ্যাম চিঠি লিখেছে। আবার মামলা-টামলা যদি হয়, ও বেটা রাঘব-বোয়াল—টাকাকড়ি হাতে যা পাবে নিজেই গিলবে, কাজকর্ম পণ্ড করে দেবে। তুমি গিয়ে কিস্তির মুখটা কাটিয়ে সব মিটমাট করে দিয়ে এসোগে। লেখাপড়া শিখেছ, আইন পাশ করলে, অন্তত নিজেদের এস্টেটপত্তোরগুলো দেখাশুনা কর।

হায়, কি কুক্ষণেই আইন পাশ করিয়াছিলাম!

দিন চার-পাঁচ পরে একটা স্যুটকেশ হাতে করিয়া রাত্রির মেলে মধুগঞ্জ স্টেশনে নামিলাম। প্রায় দশ বছর আগে আর একদিন রাত্রে এখান হইতে গাড়ি চাপিয়াছিলাম, সে সব দিনের কথা ভাল মনে নাই। তবু মনে হইল, স্টেশনটি প্রায় এক রকমই আছে। রাত্রি আর বেশি নাই, খোলা ওয়েটিং-রুম দিয়া প্লাটফরম অবধি মাঠের জোলো হাওয়া আসিতেছে। এ সময়ে যাহার নিতান্ত গরজ, তেমন লোক ছাড়া আর কাহারো জাগিয়া থাকার কথা নয়।

কিন্তু ট্রেনের মধ্যে থাকিতেই তুমুল গণ্ডগোল কানে আসিতেছিল। ওয়েটিং-রুমে দাঙ্গা বাধিয়াছে নাকি? যেই সেখানে পা দিয়াছি, আর যাইবে কোথায়—জন পঁচিশেক মানুষ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া যেন ছাঁকিয়া ধরিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে—কোথায়,

যাবেন ? কোথায় যাবেন ? সাঁতার-না-জানা মানুষ গভীর জলের মধ্যে পড়িলে যেমন হয়, আমার দশা সেই প্রকার। কোন দিকে কূলকিনারা দেখি না, পালাইবার পথ নাই।

উত্তর না দিলে কেহ পথ ছাড়িবে না, কাজেই বলিয়া ফেলিলাম—যাব সাগরগোপ।

যেইমাত্র বলা অমনি একজনে ডান হাতের স্যুটকেসটি ছিনাইয়া লইয়া দৌড়। পলক ফিরাইয়া দেখি, অন্য সকলে ঐ সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে। কিঞ্চিৎ দূরে আর একজন হতভাগ্য যাত্রীরও আমার দশা। সে দিকে আর না গিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া আসিলাম।

তা তো হইল—এখন আমার উপায় ? স্যুটকেসের মধ্যে আমার সমুদয় কাপড়-চোপড় এবং কুড়িখানি দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম। মধুগঞ্জে যে সদর জায়গায় দল বাঁধিয়া আজকাল এমন রাহাজানি শুরু করিয়াছে, তাহা জানিতাম না। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় মাইল অন্তর কেরোসিনের আলোর ব্যবস্থা আছে, কালিতে কালিতে রাত্রিশেষে আলোগুলি এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে সে আলোকে চোর চিনিয়া ধরা দূরের কথা, নিজের হাত-পাগুলি চিনিয়া লওয়াই মুশকিল।

সামনের রাস্তায় নামিয়াছি, ভক করিয়া পিছনে আওয়াজ। তাকাইয়া দেখি, সর্বনাশ—প্রায় ঘাড়ের উপরে একখানা বাস আসিয়া পড়িয়াছে। এক দৌড়ে আগে গিয়া প্রাণটা বাঁচাইলাম। তারপর ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, কেবল একখানা নহে—সারি সারি ঐ রকম বিশ-ত্রিশখানি। সকলেই স্টার্ট দিয়াছে, একবার আগাইতেছে, একবার পিছাইতেছে এবং তারস্বরে কে কোথায় যাইবে—তাহা ঘোষণা করিতেছে। চিৎকারের যেন প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। ঠিক সামনে যে

গাড়িখানি ছিল, তাহার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বলতে পার, আমার স্যুটকেশ নিয়ে এইদিক দিয়ে কে পালাল?

ড্রাইভার হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে, আসুন—এই যে—আপনি সাগরগোপ যাবেন তো? উঠে পড়ুন—এই নিন আপনার জিনিষ।

নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ভয় ধরাইয়া দিয়াছিল। ঝাঁঝের সহিত কহিলাম—তুমি বেশ লোক তো বাপু, না বলে কয়ে স্যুটকেশ নিয়ে চম্পট—

ড্রাইভার সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে, আপনারই সুবিধের জন্যে। ভারী জিনিষ বয়ে আনতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাই দেখে—

বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই আরো দুইটি লোক প্লাটফরম পার হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের পাকড়াও করিতে ছুটিয়া গেল।

সুস্থির হইয়া বসিয়া চারিদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া সম্ভ্রমের উদয় হইল। লোকে সভ্য হইয়া উঠিতেছে বটে, মফস্বল শহরেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। সামনেই হিন্দু চায়ের দোকান সাইনবোর্ডে বড় বড় করিয়া লেখা—এই যে গরম চা, আসুন—সাত্তিক ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত। ট্রেন হইতে নামিয়া ইতর-ভদ্র দলে দলে গিয়া সেই সাত্ত্বিক চা খাইতে বসিয়াছে। নূতন বায়োস্কোপ খুলিয়াছে, স্টেশনের দেয়াল জুড়িয়া তার বিজ্ঞাপন···ভ্রাম্যমান সাড়েবত্রিশভাজা-ওয়ালার ঠুন-ঠুন ঘণ্টা বাজনা···ডাক্তারখানার লাল-নীল আলো···দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, শিয়ালদহের মোড়ের খানিকটা যেন এখানে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

ড্রাইভার ফিরিয়া আসিয়া নিজের জায়গায় বসিল। যাত্রী এত ভর্তি হইয়া গিয়াছে যে একরূপ অখণ্ডমণ্ডলাকার অবস্থা। তা ছাড়া এতগুলি মানুষ নিতান্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বসিয়া নাই। গাড়ি

ছাড়িলে নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলাম। হুস-হুস করিয়া শেষ-রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এগাড়ি যাবে কদ্দূর অবধি?

ড্রাইভার কহিল—আপনি ত নামবেন সাগরগোপ—তারপর বাঁকাবড়শি মাদারডাঙা ছাড়িয়ে চলে যাবে সেই কাটাখালির কাছ বরাবর—

—নর-বাঁধ পার হবে কি করে?

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে আমার দিকে তাকাইল। বলিল—দেশে থাকেন না বুঝি? সেখানে গেল-বছর মস্ত পুল হয়ে গেছে। টার্নার-ব্রিজ—টার্নার সাহেবের আমলের কিনা! দেশের আর কি সেদিন আছে!

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই সেদিন আর নাই। বারো-চৌদ্দ বছর আগে একবার এই শহরে আসিয়া বাবার সঙ্গে তিন দিন ছিলাম। তখন এখানে এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর এক পুলিশ সাহেবের মাত্র এই দু-খানি মোটরগাড়ি ছিল। বিকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে গাড়ি চালাইয়া চৌরাস্তার পথে বেড়াইতে যান, কথাটা শুনিবার পর পাকা তিন ঘণ্টা রাস্তার পাশে তীর্থকারের মতো ধর্ণা দিয়ে তবে হাওয়াগাড়ি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জীবনের প্রথম মোটর দেখা।

ড্রাইভার লোকটির উৎসাহ কিছুতেই খর্ব হইতে ছিল না। বোধ করি, সে ইস্কুল-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া থাকিবে। আবার আরম্ভ করিল—যাই বলুন মশায়, আপনাদের স্বরাজ-টরাজ ফক্কিকার, এমন কোম্পানির রাজার মতো কেউ হবে না। রাস্তা-ঘাট রেল-স্টিমার ট্যাক্সি-বাস—আর কি চাই? করুক দেখি কোন্ বেটা পারে?

খাড়া বসিয়া থাকিয়াও ঘুমানো যায়, আগে জানিতাম না। সকলেই ঘুমাইতেছে, আমিও চোখ বুজিয়া আছি। সেই অবস্থায় নবনির্মিত টার্নার-ব্রিজ কোন সময়ে পার হইয়া আসিয়াছি, বুঝিতে পারি নাই। সাগরগোপের ইস্কুলঘরের কাছে নামিলাম, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। এখান হইতে মাইলটাক হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে হয়। ডাহিনে দেখিলাম, পুঁটিমারির বিলে জল চক-চক করিতেছে! চমক লাগিল—কাণ্ডখানা কি? দশ বছর আগেকার কথা সঠিক মনে নাই। তবু আবছা স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—এই সময়ে ঘন সতেজ সবুজ ধানে এই বিল ভরিয়া থাকিত। লক্ষ্মী-ঠাকরুণ তাঁর সকল সম্পদ যেন উজাড় করিয়া ঢালিতেন এখানে। যতদিন দেশে ছিলাম, কখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পাঁচু মোড়ল, বিশে মোড়ল, রাইচরণ দাস, সর্দারেরা দু-ভাই—কান্তরাম-শান্তরাম,—ইহারা ফি বছর এক-একটা গোলা বাঁধিত। গোলা তৈয়ারি করা এ অঞ্চলের মানুষের যেন নেশার মতো হইয়া গিয়াছিল। তেঁতুলতলায় মুচিরা রান্না করিত, টপ-টপ করিয়া কুড়ালের উপর মুগুরের ঘা দিয়া বাঁশ ফাটাইত, সর্দারদের মজাপুকুরে আঁটি বাঁধিয়া বাখারি পচাইতে দিত সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

রাস্তার পাশে একজন লোক একমনে বসিয়া মাছ-ধরা দোয়াড়ি বুনিতেছিল। কহিলাম—মাছ পড়ছে খুব?

লোকটি উত্তর করিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

সেটা বটতলা। শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া তরঙ্গাকুল সীমাহীন জলরাশি দেখিতে বেশ লাগিতেছিল। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম—ও মোড়লের পো, বিল যে এবার একদম ওঠেনি—বড্ড বর্ষা হয়েছিল নাকি?

এবার লোকটি চাহিয়া দেখিল। হাতের কাছের একখণ্ড বাঁশ আগাইয়া দিয়া কহিল—বসুন।

আমি বলিলাম—না, বসবো না আর। তোমাদের বাড়ি বুঝি ঐ গাঁয়ে ? ঘরগুলো বেশ দেখাচ্ছে, সুন্দর এক একটা দ্বীপের মতো—

দ্বীপ কাহাকে বলে লোকটার জানা নাই, অতএব দ্বীপের সৌন্দর্য বুঝিতে পারিল না। মোটে সেদিক দিয়াই গেল না। কহিল—বাবু, আমরা মহারাণীর কাছে দরখাস্ত করব—

কিসের দরখাস্ত ?

—নর-বাঁধ বেঁধে ছোট করে পোল দিয়েছে, মহারাণী এসে পোল ভেঙে দিয়ে যান। পোলে কাজ নেই আমাদের—যেমন ছিলাম তেমনি থাকি। এত বড় বিলের জল এই ফাঁকটুকুতে বেরোয় কখনো ? তিনি নিজের চোখে একবার দেখে যান না—

ভারি বিরক্ত হইলাম। যত ভাল কাজই গভর্নমেণ্ট করুক না কেন, দেশের লোকের খুঁত ধরা কেমন স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর পাড়াগাঁয়েও সে বিষ ঢুকিতে বাকি নাই। বলিলাম—টাকাকড়ি খরচ করে পোল দিয়েছে—বড্ড অপরাধের কাজ করেছে! আগে এখানে বুকজল হত—লোকে পার হত গামছা পরে। আর আজকে দিব্যি মোটরে করে চলে এলাম—এক ফোঁটা জল-কাদা গায়ে লাগল না। কত বড় সুবিধে বল দিকি!

লোকটি তাতিয়া উঠিল। রুক্ষকণ্ঠে কহিল—ছাই হয়েছে, ঘরদোর জায়গাজমি জলে ডুবে রয়েছে। হঠাৎ গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—এ কি রকম জুলুমবাজি! গোলায় এক চিটে ধান নেই—ঘরের মধ্যে ভাসা-বাদার সাপ উঠেছে, খুঁটির গোড়ার মাটি জলে ধুয়ে যাচ্ছে, কোন দিন ঘরখানাই বা ধ্বসে যায়! তোমরা তো বাপু মোটরে চড়ে ফূর্তি করে বেড়াও, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে ছেলেপুলের হাত ধরে আমরা কোথায় যাই বলো তো ?

বলিতে বলিতে লোকটি চুপ করিল। বোধকরি বা কান্না সামলাইল। পুরুষ মানুষের কাঁদিতে নাই কিনা!

একটু স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লিখলে মহারাণীর ঠিক দয়া হবে—কি বল বাবু? তুমি যাচ্ছ কোন গাঁয়ে?

—ওই তো সামনেই—ইন্দির ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি। আমি তাঁর ছেলে, এখন বাড়িঘরে থাকিনে।

লোকটি কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলাম করিল। কহিল—চিনলাম। তোমার বাড়িতে আমরা যাব, একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে। এই আমাদের যত দুঃখ ধান্ধার কথা ভাল করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে··· ভাল করে লিখলে মহারাণী ঠিক শুনবে—একটা ভাল জলপথ করে দিয়ে যাবে। যাবে না? আমরা ঠিক করেছি সব চাষা মিলে দরখাস্ত ছাড়ব।

নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী আমাকে হয়তো মহারাণীর জ্ঞাতিগোত্র ঠাওরাইয়াছে। যে যাহা ভাবুক, আমার ক্ষমতার দৌড় আমি তো বুঝি—হাঁ-না কিছুই না বলিয়া কেবলমাত্র ঘাড় নাড়িয়া হাঁটিতে শুরু করিলাম। পিছন হইতে শুনিলাম, লোকটি বলিতেছে, যদি দরখাস্ত না শোনে জোর করে ঐ পোল ভাঙব, তারপর জেল-ফাঁস যা হয় হোক। মরছিই তো, ঐ ভাবে মরি।

দশ বছর পরে বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া সে বাড়ি আর চিনিতে পারি না। উত্তর-দালানের ছাত খসিয়া পড়িয়াছে, সিঁড়ির ঘরের মাথায় প্রকাণ্ড আকাশভেদী অশ্বত্থগাছ, ভিতরের উঠানে একহাঁটু উঁচু ঘাস। ঘনশ্যাম গাঙ্গুলি দাখিলা লিখিতেছিল—কিতাব ফেলিয়া হাঁ-হাঁ

করিয়া উঠিল—ওদিকে যাবেন না, ওদিকে যাবেন না—পরশু ঐ ঘাসের মধ্যে কেউটে সাপের খোলস পাওয়া গেছে। সঙ্গের মুটেটাকে ডাকিয়া কহিল—হাঁ করে দেখছিস কি বেটা? ঐ চামড়ার বাক্স-টাক্স কাছারিঘরে এনে রাখ—

কাছারিখানির অবস্থা ভালই বলিতে হয়।

বাঁশের খুঁটি, চাঁচের বেড়া। সারি সারি তিনখানা তক্তাপোশ—তার উপর সতরঞ্চি পাতিয়া ফরাস করা হইয়াছে। ডাবাহুঁকা হুঁকাদান,—ত্রুটি কিছুই নাই। পাশে রান্নাঘর। পিছনে জঙ্গলে ভরা বৃহৎ বাড়িটার সহিত সদরের কাছারীবাড়ির কোন সম্পর্ক নাই।

ঘনশ্যাম অর্থটা সামঝাইয়া দিল। বলিল—দরকার কি? অত বড় বাড়ি মেরামতি অবস্থায় রাখা আর ঐরাবত হাতী পোষা এক কথা। ও বছর কর্তাবাবু এসে মেরামতের কথা বললেন, আমি বললাম—এখন কাজ নেই, আপনারা যদি কখনো দেশে-ভূঁয়ে আসেন তখন সে-সব। ঘোড়া হলে চাবুকের জন্যে আটকাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন আছ নায়েব মশায়?

ঘনশ্যাম বলিল—আছি ভাল আপনাদের দয়ায়। মাছটা খুব মিলছে আজকাল, জিনিসপত্তোরেরও সুবিধে। জন-মজুর ভারি সস্তা,—দু-আনায় সমস্ত দিন খাটছে। আগে খোশামোদ করতে করতে প্রাণ যেত—এখন বাবা, পায়ে ধর আর কাজে লাগ। কোন বেটার ঘরে কিছু নেই—

—বিলে চাষ বন্ধ বলে বুঝি?

ঘনশ্যাম বলিল—তা ছাড়া আর কি। বেঁচেছি মশায়, ছোট লোকের ঘরে পয়সা হলে রক্ষে আছে? বিল যে আর ইহজন্মে উঠবে তার কোন ভরসা নেই।

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগল।

বলিলাম—তা হলে ওদের চলবে কি করে?

—না চলে, উঠে যাক। যাচ্ছেও। অত বড় পূব-পাড়ার মধ্যে একলা রাইচরণ আর তার ছুটো ভাইপো টিম-টিম করছে। ওরাও যাবে শিগগির—ভিটেয় থেকে কি নোনা জল খেয়ে থাকবে? সেবার পঁচিশ শ'টাকা গুণে দিয়ে আমাদের এস্টেটে পঁচিশ বিঘা জমি মৌরশি নিয়েছিল মশায়, আষাঢ় মাসে এসে বলে—নায়েব মশায়, খাওয়া জুটছে না—ছেলেপিলেগুলো শুকিয়ে মরছে, চোখের উপর আর দেখতে পারি নে। মনটা আমার বড্ড নরম, শুনে কষ্ট হল। বললাম—এক কাজ কর রাইচরণ, এই পঁচিশ বিঘে বরং বাবুদের এস্টেটে ফের বেচে ফেল্—দশ টাকা হিসেবে বিঘে, আড়াই শ' টাকা পাবি।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম—আড়াই হাজারে কিনে আড়াই শ' টাকায় বিক্রি—রাজি হল?

নায়েব অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—না, হয় নি—উল্টে আবার দল পাকাচ্ছে। কিন্তু তাই বা দেয় কে? জলে-ডোবা জমি দাম আছে কিছু? ওদের এখন ঘরপোড়া ছাই—যা পাবে তাই লাভ। তবু তো বুঝতে চায় না বেটারা।

—কিন্তু আমাদেরই বা ঐ জমি কিনে কি হবে?

ঘনশ্যাম আমার অজ্ঞতায় অবাক হইয়া খনিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে বলিল—লাভ নয়—বলেন কি? এ-ই তো চাই আমরা। সমস্ত চক এমনি করে আস্তে আস্তে খাস করে নেব। তারপর গোটা বিলটা জেলেদের কাছে বিলি হবে। জলকরে সুবিধে কত মশাই? প্রজা-বেটাদের নানান আবদার—আজ বাঁধ ভাঙল, কাল নোনা লেগেছে—হেনো কর তেনো কর। এখন কিচ্ছু

হাঙ্গামা নেই—বছর অন্তর জেলের কাছ থেকে করকরে টাকা একসঙ্গে গুণে নেও—তারা জাল ফেলুক—মাছ ধরুক—ব্যস! ধানে আমাদের গরজটা কি? টাকা হলেই হল।

চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, পুঁটিমারির বিল-ডুবি হওয়ায় জমিদারের লোকসান নাই। মরিতে মরিবে অভাগা প্রজারা। সাতপুরুষের ভিটে ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।

ঘনশ্যামের কৃতিত্বের কাহিনী তখনো শেষ হয় নাই। বলিতে লাগিল—শুনি, ঐ রাইরচণ নাকি গোপনে দল পাকাচ্ছে। ওরা ভাবে, আমরা চেষ্টা করলে বিলের জলপথটা বড় করে দিতে পারি। আরে বাপু, পারি তো পারি—আমরা তা করতে যাব কেন? যা আছে তাতে আমাদের গরলাভটা কি? দল পাকানো হচ্ছে, কোন জেলেকে বিলের মধ্যে নামাতে দেব না—দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবে। তা হলে নাকি আমাদের গরজ হবে।

বলিয়া হা-হা করিয়া আর এক দফা হাসিয়া লইল। বলে—জমিদারীর কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কি পিছপাও? বোঝে না বেটারা—

আমি বলিলাম—না, কোন হাঙ্গামা না বাধলেই ভাল।

ঘনশ্যাম কহিল—কিছু ভাববেন না, আপনি কেবল চুপ করে বসে বসে দেখুন না। এখনো জানে না, ঘনশ্যাম গাঙ্গুলি লোকটা কে। ঐ রাইচরণের গুষ্টিশুদ্ধ দেশছাড়া করব না? টিঁকবে ক'দিন? দেখুন গিয়ে, আপনার রজনী পাইক এখনো ঠিক ওর উঠোনে গিয়ে বসে রয়েছে—

বলিয়া একটুখানি থামিল। আবার দম লইয়া বলিতে লাগিল—

এদিকে বেটা আবার বলে, আমরা মানী ঘর—মান রেখে কথাবার্ত্তা না বললে চলবে না। না যদি চলে—বেশ তো, বাস ওঠাও। সোজা পথ দেখা যাচ্ছে—থাকবার জন্যে পায়ে ধরে খোশামোদ কে করছে বাপু? আমরাও তো তাই চাই। পরশু দুপুরে হয়েছে কি মশায়, রজনী ওর দাওয়ায় চেপে বসেছে, রাইচরণ বাড়ি নেই—ছেলে দুটো ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। বোঝা গেল, চাল বাড়ন্ত। ভারি রসিক আপনার কাছারির পাইক এই রজনী। জানে সব, তবু বলে—খাজনার টাকা দাও, নইলে উঠছি নে। আর নয় তো নতুন হাঁড়ি বের কর—চাল আন—ডাল আন—সিধে সাজাও—যে ক'দিন টাকা না পাব তোমাদের বাড়ি অতিথ হয়ে থাব। তিনটে গোলা আছে—তিন বেলা তিন গোলার ধানের চাল। চাষা লোকের মেয়ে হলে কি হয়, রাইচরণের বৌটার বুদ্ধি খুব। খোঁটাটা বুঝতে পারল, চোখ দিয়ে তার টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।

দিন পাঁচ-সাত কাটিয়া গেল। ভালই কাটিল, নায়েব মশায়ের আয়োজনের ত্রুটি নাই। পুঁটিমারির বিল হইতে সকালে বিকালে ঝুড়ি ঝুড়ি টাটকা মাছ আসিতেছে, গঞ্জ হইতে দাদখানি চাউল। দুধেরও অপ্রাচুর্য নাই। দুপুরে খাইতে বসিয়াছি, ঘনশ্যাম লোনা ও মিঠা জলের মাছের আস্বাদের তুলনা করিতেছে। হঠাৎ বিশ ত্রিশ জন লোক ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতে করিতে কাছারিবাড়ির উঠানে দৌড়িয়া আসিল।

খুন! খুন! খুন!

খাওয়া ঐ পর্যন্ত। দেখিলাম, বড় বিপদের মধ্যেও ঘনশ্যাম বিচলিত হয় না।

—খুন কি রে? কে কাকে খুন করলে?

—রজনীকে। রাস্তায় লাস পড়ে আছে—রাইচরণ আর তার ভাইপোরা সড়কি মেরেছে। কাছারি নাকি লুঠ করতে আসছে।

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—আসুকগে। বেটাদের বড় বাড় হয়েছে—আচ্ছা! আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—কিছু ভাববেন না, বিছানা পাতা আছে—বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমি লাসটা নিয়ে আসি। দেখি, কদ্দুর কি গড়াল।

জন কয়েক ধরাধরি করিয়া রজনীকে লইয়া আসিল। চক্ষু মুদ্রিত। তাজা রক্তে কাপড়-চোপড় ও সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে—এক এক জায়গায় রক্ত চাপ বাঁধিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। হাঁটুর নিচে হইতে তখনও রক্ত গড়াইয়া গড়াইয়া কাছারিঘরের দাওয়ার উপর পড়িতে লাগিল। ঘনশ্যাম খানিকটা পিছনে, ক'জনের নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর লইতে লইতে আসিতেছে। এমন দৃশ্য আর দেখি নাই। আপাদমস্তক হিম হইয়া গেল, মনে হইল মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব।

হঠাৎ দেখিলাম, লাসটি কথা কহিতে কহিতে দিব্য উঠিয়া বসিল। যাক—মরে নাই তাহা হইলে!

ঘনশ্যাম কহিল—তবু ভালো যে মরিস নি, তা হলে সাক্ষি পাওয়া মুশকিল হত—

রজনী হাত দিয়া ক্ষত-মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—ওরা তাক করতে পারে নি। পায়ে সড়কি মারলে কখনো সাবাড় হয়? দিতে পারত আর খানিক উঁচুতে তলপেটে বসিয়ে! আমি নিজেই হয়তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একরকম চলে আসতে পারতাম নায়েব মশায়, কিন্তু চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম। লোকের হৈ-চৈ শুনে কেমন ভয় ধরে গেল।

নানা রকম গাছ-গাছড়া শিলে বাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইয়া দেওয়া

হইল। এমনি ঘণ্টাখানেক চলিল। রক্ত বন্ধ হইল। রজনীর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এত কম আঘাতে উহারা কাবু হয় না। আর এ রকম ব্যাপার উহার জীবনে অনেকবারই ঘটিয়াছে।

অতঃপর ঘনশ্যামের মোকর্দমা সাজাইবার পালা। জিজ্ঞাসা করিল —ঘটনাটা কি রে?

রজনী কহিল—এমন কিছু নয়। আপনার হুকুমমতো গিয়ে বললাম,—আজ যদি কাছারি না যাস রাইচরণ, কান ধরে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম। রাইচরণ বলল, তুমি একটু দাঁড়াও, কাপড়খানা ছেড়ে দুটো টাকা গাঁটে নিয়ে আসি—কাছারিতে ছোট বাবু এসেছেন, শুধু হাতে যাওয়া যায় না—তাঁর নজরানা। আমি গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে সড়কি বসিয়ে দিল—

সমস্ত বিকাল ধরিয়া কতলোক যে আসাযাওয়া করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি নির্লিপ্তের মতো একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘনশ্যাম পরামর্শ আঁটিতে লাগিল, সাক্ষি সাজাইতে লাগিল, আবার জেরা করিয়া তাহাদের ভুল ধরাইয়া দিতে লাগিল। মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না, রাইচরণকে লইয়া অনতি-বিলম্বে ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হইবে। সন্ধ্যার আগে ঘনশ্যাম কহিল—এইবার ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি হয়ে গেল, আমি থানায় চললাম। খবর পাচ্ছি,—বেটারা ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছে, রাত্রিবেলা কাছারি এসে খানিক হৈ-চৈ করতে পারে। আপনি একটু সাবধান হয়ে থাকবেন মশায়, রাগটা মনিব-চাকর সকলের উপর গিয়ে পড়ছে কিনা! তাহলেও ভয়ের কিছু নেই, করতে পারবে না কিছু।

পাহারার জন্য ঘনশ্যাম গোপন ব্যবস্থা যদি কিছু করিয়া গিয়া থাকে

তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকাশুত ফরাসের উপর বসিয়া রহিলাম কেবল মাত্র আমি এবং নিচে খোঁড়া পা লইয়া রজনী পাইক। সন্ধ্যার পরেই কেবল কাছারিবাড়িতে নয়, সমস্ত গ্রামের মধ্যে মানুষের সাড়া একদম বন্ধ হইয়া গেল। দুপুরে তাজা নররক্তের যে প্রবাহ দেখিয়াছি অন্ধকারের মধ্যে যেন তাহার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। ঘরের সামনেই আম-কাঁঠালের ঘন বাগান। এক একবার মনে হইতে লাগিল, সড়কি-বল্লম লইয়া কাহারা যেন পা টিপিয়া টিপিয়া উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে আমার ঘরের কানাচের দিকে আসিতেছে। হেরিকেনটা সত্যসত্যই একবার উঁচু করিয়া দেখিয়া লইলাম। দুয়ার খোলা, রজনী নিকটেই বসিয়াছিল। দুয়ারটা ভেজাইয়া দিতে বলিলাম। রজনী খোঁড়া পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খিল আঁটিয়া দিল, কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। বোঝা গেল, ভয় কেবল আমার একার নহে। মেঘ জমিয়া চারিদিক এত আঁধার করিয়াছে যে এরূপ ভাব আমার জন্মে দেখি নাই। এই অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্রোহী রাইচরণের দল নিশ্চয় চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এমনি আশঙ্কায় গা ছমছম করিতে লাগিল। ঘনশ্যাম সেই যে থানায় গিয়াছে, এখনো ফেরে নাই। রান্নাঘরে আলো নিবানো। যে লোকটা রান্না করিয়া থাকে সে এই দুর্যোগে হয়ত আসে নাই, কিংবা আসিয়া থাকে ত ইতিমধ্যে কোন গতিকে কাজ সারিয়া খিল আঁটিয়া দিয়াছে। রজনী তামাক সাজিয়া আপন মনে টানিতে লাগিল। যা হোক কিছু কথাবার্তা কহিবার জন্য বলিলাম—ও রজনী, রাইচরণের পশ্চিম ঘরের কানাচে যে রাস্তা—কাণ্ডটা ঘটল বুঝি সেইখানে?

রজনী উত্তর করিল না, যেন শুনিতেই পাইল না।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—রাইচরণ কি বলছিল? কাছারিতে ছোট বাবু এসেছেন, তাঁর নজরানা নিয়ে যাচ্ছি—এই না?

রজনী মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে ইসারা করিয়া চুপি চুপি কহিল—ওসব কথা থাকগে এখন বাবু, রাতবিরেতে দরকার কি? কে কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে, তার ঠিক নেই—

কথা শুনিয়া সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। ইহা সম্ভব বটে। আমি যেখানে বসিয়া আছি তাহার পাশে একটি চাঁচের বেড়ার ব্যবধানে হাত দুয়েকের মধ্যে হয়ত সেই খুনে লোকেরা ঢাল-সড়কি লইয়া দল বাঁধিয়া নজরানা দিতে বসিয়া আছে। দশ বছর পরে পাড়াগাঁয়ে পা দিয়াছি, দশ বছর আগেকার যে-সব দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি এখনো মনের মধ্যে আছে, সে সময়ে মানুষ এমন করিয়া মানুষের রক্তপাত করিত না। তখন দেখিতে পাইতাম, ক্ষেত চষিবার ও গোলা বাঁধিবার ভীষণ প্রতিযোগিতা। পেটে খাইতে যে পয়সা খরচ হয় এ বোধ কাহারও ছিল না। আমাদের বাড়িতেইদেখিয়াছি—উনুনে সমস্ত দিন অনির্বাণ রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। সেজ জেঠাকে কালোয়াতি রোগে ধরিয়াছিল, পাখোয়াজ ঘাড়ে করিয়া ক্রোশ দুই দূরে মাদারডাঙায় চলিয়া যাইতেন। রাত্রি দুপুর হইয়া যাইত। কোন দিন মোটে ফিরতেন না, আবার কোন কোন দিন একেবারে জন পাঁচ-সাত সঙ্গী লইয়া হানা দিতেন। তখন হয়ত ঠাকুরমা, ন-পিসি, জেঠাইমা-রা সকলে শুইয়া পড়িয়াছেন। আবার উঠিয়া ভাত চাপাইতে হইত, মুখে একটু বিরক্তভাব কখনও দেখি নাই। বাড়িতে লোক আসিয়াছে, রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানো—ইহা ত মস্ত আনন্দের কথা। এখনকার রীতিনীতি দেখিয়া অনেক সময় সন্দেহ হয়, হয়ত উহা কবে একদিন ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম—উহার কোন সত্য অস্তিত্ব নাই। পরক্ষণে আবার তাকাইয়া তাকাইয়া দেখি, কান্তরামের বড়ছেলের কুঁড়েঘরের পাশটিতে জঙ্গল-ভরা সারি সারি পাঁচটি গোলার ভিটা নিবস্ত পঞ্চপ্রদীপের মতো

এখনো পড়িয়া আছে। তখন মনে হয়—না, মিথ্যা নয়—স্বপ্ন নয়—উহা সত্য, সত্য !

বেড়ার ফাঁকে নজর পড়িল, রাস্তার উপর একটি আলো।

—কে ? ও কে ? কথা বল না কেন ?

কেবলই প্রশ্ন করিতেছি, কিন্তু উত্তর দিতে যেটুকু অবকাশের প্রয়োজন তাহা দিতেছি না। রজনীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত সমস্বরে প্রশ্ন শুরু করিল। আলো নিরুত্তরে আসিয়া কাছারির দাওয়ায় উঠিল; তারপর বলিল—রজনী দুয়ার খোল্।

ঘনশ্যামের কণ্ঠস্বর। যাক—রক্ষা পাইলাম।

সঙ্গে আর কাহারা আসিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশে ঘনশ্যাম বলিল—তোরা বাপু বাড়ি যা—আর দরকার নেই। তারপর গলা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—অত চেঁচামেচি করছিলেন কেন ? রাহাজানি করতে আসে কি হেরিকেন জ্বেলে সন্ধ্যাবেলায় ?

তা বটে। ভাবে বোঝা গেল—বেশ জোর পায়েই ঘনশ্যাম চলিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া জিরাইয়া লইল, তারপর রজনীর দিকে চাহিয়া কহিল—তুই বেটা এরি মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিস যে ! মোকর্দমার অসুবিধে হবে। হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে নিদেনপক্ষে তিনটি মাস। সেই রকম এজাহার লিখিয়ে দিয়ে এলাম। বলিয়া হঠাৎ যেন কি মনে পড়িয়া গেল—রজনী, একটু বাইরের দিকে গিয়ে বোস—

হুকুম ত হইয়া গেল, কিন্তু আজিকার রাত্রে বাহিরে গিয়া বসা যে-সে কর্ম নয়। একবার সড়কির তাক ফস্কাইয়া পায়ে আসিয়া বিঁধিয়াছে, বারান্তরে উহারা ভুল সংশোধন করিয়া লইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি ? অথচ মুশকিল এই, এতবড় কাছারির পাইকের পক্ষে ভয়ের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। রজনী যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল।

ঘনশ্যাম হুঙ্কার দিয়া বলিল—বেটা শুনতে পাস নে ? বলছি, একটা গোপন কথা আছে—

নিতান্ত মরীয়া হইয়া রজনী ডানহাতে লইল একখানা লাঠি, তারপর অতি সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাইয়া দাওয়ার কোণে গিয়া বসিল।

ঘনশ্যাম ফিসফিস কারয়া কহিল—এই ইয়ে—টাকাকড়ি যা আছে একটা থলিতে ভরে কোমরে বেঁধে ফেলুন, গতিক বড় সুবিধের নয়—বুঝলেন ? কাগজ-পত্তোর যা কিছু গোলমাল দেখে অনেকদিন আগেই সরিয়ে ফেলেছি।

তারপর ধাঁ করিয়া তাহার গলা একেবারে সপ্তমে চড়িল। —থানায় গিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ—ছোট দারোগা বড় দারোগা দু-জনেরই পাত্তা নেই সকাল থেকে। শেষকালে এলেন অবশ্যি। কাজ বাগিয়ে নিয়ে চলে এলাম। তাইতে দেরি হয়ে গেল। টুনেঘরা ডাকাতির কেসে গিয়েছিলেন। বিল-ডুবি হয়ে বেটারা যেন সিংহীর পাঁচ-পা দেখেছে—কেবল খুনজখম চুরি-ডাকাতি। টের পাবে, টের পাবে —'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে—'

কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিয়াই চুপ করিল। একটু পরে নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম—রাত অনেক হয়েছে, খেয়ে দেয়ে এবার শোবার ব্যবস্থা হোক—ঘুম পাচ্ছে—

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠিক কথা, সকাল থেকে আবার খাটুনি শুরু। একসঙ্গে একেবারে বিশখানা ওয়ারেণ্ট বের করে এসেছি। রাত না পোহাতেই বন্দুক-টন্দুক নিয়ে পুলিস আসবে। তখন এক এক বাড়ি ঘেরাও কর, আর মেয়ে-মর্দ ধরে ধরে চালান দেও। সড়কি-মারা বের করে দিচ্ছি। ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি।

চোখ টিপিয়া ইসরায় আমাকে বলিল—আশে পাশে যদি কেউ থাকে ত শুনে যাক—ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবে।

রজনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার মুখ পাংশু। অন্ধকারের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল—নায়েব মশায়, মানুষ—আশশ্যাওড়ার বন ভেঙে মড়মড় করে চলে গেল।

আমি কহিলাম—শেয়াল-টেয়াল হবে, তোমার ভয় লেগেছে রজনী, তাই ঐ রকম ভাবছ। তুমি ঘরের মধ্যে এসে বসো—

ঘনশ্যাম মৃদুস্বরে বলিল—যাই হোক, এখন আর রান্নাঘরে গিয়ে কাজ নেই—ঘরের বেড়াটা তেমন সুবিধের নয়। এক রাত না খেলে কেউ মরে যায় না মশায়। গেল বছর কি হল—সাতবেড়ে কাছারিতে ম্যানেজার কালীচরণ শিকদার এলেন তদারক করতে। ভদ্রলোক কেবল মাছের ঝোলের বাটি টেনে নিয়ে বসেছেন—গুড়ুম করে এক গুলি। দিন দুপুরে এত বড় কাণ্ড—অথচ খুনের মোটে আস্কারাই হল না। সমস্ত প্রজা একজোট কিনা!

শুনিয়া আর ক্ষুধা রহিল না। বলা ত যায় না, রান্নাঘরে যদি রাইচরণ নজরানা লইয়া দেখা করিতে আসে! এদিকে কোথাও কিছু নয়, লোকজন কাহাকেও দেখিতেছি না, ঘনশ্যাম আরম্ভ করিল বিষম চেঁচামেচি—

—ওরে বেটা উজবুক, হাঁ করে রইলি যে! সমস্ত রাত এইরকম কাটবে নাকি? তুই না পারিস আর কাউকে বল। ফরাসের উপর দুটো তোষক পেতে দিক। আলনার পরে চাদর আছে, বাবুর বিছানায় পেতে দে—আমার লাগবে না। আর দুটো কাঁথা দিস, রাত্তিরে বৃষ্টি হলে শীত লাগতে পারে—

বলিয়া কিন্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ঘনশ্যাম নিজেই চটপট

সমস্ত পাতিয়া লইল। দুইজনে শুইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই আবার উঠিয়া আলো নিভাইয়া দিল।

বলিলাম—আলো জ্বালা থাকলেই ভাল হত।

ঘনশ্যাম কহিল—না, মিছে তেল পুড়িয়ে লাভ কি! বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহার পর বোধকরি ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ গলার উপর মানুষের হাতের শীতল স্পর্শ। একমুহূর্তে ঘুমের মধ্যেও সারাদিনের আতঙ্ক মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। রাইচরণের দল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গলা কাটিতে আসে নাই ত? চিৎকার করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় ঘনশ্যাম আমার মুখের উপর হাত চাপিয়া চুপি-চুপি কহিল—আমি—আমি—ভয় পাবেন না। উঠুন ত।

উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো যেন জ্বলিতেছে, হাতে লম্বা সড়কি। বলিল—এখানে শোয়া হবে না। বেটারা হন্সে-কুকুরের মতো ক্ষেপে গেছে, রাত্রে কি করে বসে তার ঠিক নেই। চলুন—

আবার চলিতে হইবে—বলে কি! ঘুম উড়িয়া গেল। ভগবান, কাহার মুখ দেখিয়া যে এই জংলি পাড়াগাঁয়ে মরিতে আসিয়াছিলাম! এই ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রে না জানি কোথায় যাইতে হইবে!

ঘনশ্যাম বলিতে লাগিল—উঠুন, অসুবিধে কিচ্ছু নেই—বেশ ভাল জায়গা দেখা আছে। এ গ্রামে কাউকে বিশ্বাস করিনে, পেটে ক্ষিধে তো সকলের! ক্ষিধের চোটে দু-চারটে ছিটকে এসেছে আমাদের দলে, খবরাখবর দেয়, দল ভাঙাভাঙি করে। কিন্তু কোন্ বেটার মনে কি আছে কে জানে?

—যাচ্ছি কোথায় তা হলে?

বাঁকাবড়শি নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ি। আবার ঘোর থাকতে ফিরে এসে শোব—কাক-পক্ষীতে টের পাবে না।

বাঁকাবড়শি গ্রাম আমার চেনা, অনেক বৈঁচির জঙ্গল আছে। ছোট-বেলায় বৈঁচি-ফল খাইতে খাইতে একদিন ততদূর অবধি চলিয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—সে তো অনেক দূর—

ঘনশ্যাম বলিল—কোথায় দূর! মোটে আধ ক্রোশ পথ। খাল পার হতে হবে—তা মজবুত সাঁকো বাঁধা আছে—অসুবিধে কিছু নেই—

না থাকিলেই ভাল। আর সে বিবেচনা করিবার অবসরই বা দিল কোথায়? জুতা পায়ে দিতেও ঘনশ্যামের আপত্তি, বলিল—উঁহু, শব্দ হবে। কে কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে—কাজ কি! দাঁড়ান—

বলিয়া একটা পাশের বালিশ আমার শিয়রের বালিশের উপর শোয়াইল, সযত্নে তাহার উপর কাঁথা চাপা দিল। অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু বিছানার ঠিক পাশে বসিয়াছিলাম বলিয়া সমস্ত টের পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ আবার কি ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—এ মতলব থানা থেকে আসবার পথেই ভেবে রেখেছি। ঐ যে হৈ-চৈ করে আপনার জন্য বিছানা করতে বললাম, সব তার মানে আছে, মশায়। আশেপাশে চর-টর যারা আছে, শুনে গিয়ে খবর দিক। কাঁথা-চাপা পাশবালিশ রইল, রাত্রে ঘরে ঢুকে আপনি শুয়ে আছেন মনে করে কোন বেটা যদি কোপ-টোপ ঝাড়ে, কি বেকুব হবে বলুন ত! কালকে এসে হয়ত দেখব, বালিশটা দুইখণ্ড হয়ে আছে।

স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম শত্রুর সম্ভাবিত বেকুবিতে ঘনশ্যাম ভারি খুশি হইয়াছে।

নিঃশব্দে সে দরজা খুলিল, আমি পিছনে পিছনে চোরের মতো বাহির

হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল লাগাইলাম। টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইয়াছে। কোথাও হাঁটু অবধি কাদা, জায়গায় জায়গায় জল বাধিয়া রহিয়াছে, জল ছিটকাইয়া একেবারে মাথা অবধি উঠিতেছে। সে যে কি দুঃখের যাত্রা, মনে করিলে এখনও কান্না পায়। খালি পা, অন্ধকারে ছাতা খুঁজিয়া পাই নাই। তার উপর ঘনশ্যাম ফাঁকা রাস্তা দিয়া চলিতে দিবে না, তাতে আততায়ীর নজরে পড়িবার সম্ভাবনা। বনজঙ্গল ভাঙিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। রক্কার মধ্যে অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি খুলিয়া গিয়া ঘনশ্যামের অস্পষ্ট মূর্তি দেখিতে পাইতেছিলাম! কোথা দিয়া কোনখানে যাইতেছি তাহার কিছুই আন্দাজ ছিল না, কোন গতিকে উহার পিছন ধরিয়া চলিয়াছিলাম। এক একবার সে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লয়, আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি—কি? কোন কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি? ঘনশ্যাম জবাব দেয়—না, চলুন। আবার অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ একবার পিছনে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—সর্বনাশ, শুধু হাতে আসছেন নাকি? শিগগির একটা জিওলের ডাল ভেঙে নিন—শিগগির—

ক্রমে খালের ধারে পৌঁছিলাম। মেঘ ও অন্ধকার আবার এত জমিয়া আসিল যে ঘনশ্যামকেও আর দেখা যায় না। অতঃপর চোখ দিয়া দেখিয়া নয়—পা দিয়া স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম, বাঁশের সাঁকোর উপর উঠিয়াছি। একখানি মাত্র বাঁশ। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার উপর দিয়া যাইতেছি, হাতে ধরিবার জন্ম আর একখানি বাঁশ উপরে বাঁধা আছে! দুইটা মানুষের ভারে বাঁশ মচ-মচ করিতে লাগিল, বুঝি বা সবশুদ্ধ ভাঙিয়া চুরিয়া নিশীথরাত্রে খালের জলে গিয়া পড়িতে হয়।

ঘনশ্যাম উপরে গিয়া নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—যাক, নিশ্চিন্ত।

খাল পার হয়ে কোন শর্মা আর এদিকে আসছেন না। এই খাল হল আমাদের এলাকার সীমানা—

আবার বলিল—এখনো পার হতে পারলেন না? তা আসুন—আস্তে আস্তেই আসুন মশায়। খুব সাবধান হয়ে ধরে ধরে আসবেন,—বৃষ্টির জলে বাঁশ পিছল হয়ে গেছে। সেদিন একটা লোকের এইখান থেকে পড়ে যা দুর্গতি—ভাসতে ভাসতে আর একটু হলে বেড়জালের মধ্যে ঢুকে গেছল আর কি—

খাল পার হইয়াও পথ ফুরাইল না। কত পথ চলিলাম জানি না, শেষে বাঁশের বেড়া ডিঙাইয়া এক গৃহস্থের বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘনশ্যাম বলিল, নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ি।

তবু ভাল। ভাবিয়াছিলাম, তাহার ঐ আধ ক্রোশ পথ চলিতে বুঝি সমস্ত রাত্রিতেও কুলাইবে না।

ঘনশ্যাম বাহিরের আলগা বড় ঘরখানির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু পা দিয়াই চক্ষের নিমেষে নামিয়া পড়িল। যেন সাপ দেখিয়াছে। এদিকে কাদায় বৃষ্টিতে সমস্ত কাপড়-চোপড় মাখামাখি, মাথা দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, একটুখানি আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যাই। আবার নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া বিরক্তি ধরিল। সারারাত এমনি করিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইবে নাকি? এমন দগ্ধিয়া মরার চেয়ে সড়কির আঘাতে প্রাণ দেওয়া যে ঢের ভাল ছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হল?

জবাব দিল—এখানে হবে না। এ ঘরে কেউ শোয় না বলে জানতাম; আজকে দেখছি এক পাল মানুষ—

আমি কহিলাম—হোক গে। মানুষ শুয়েছে—বাঘ ত নয়। তুমি

ওদের ডেকে বল। দু-জনে একটা রাত মাথা গুঁজে পড়ে থাকব—তা দেবে না? যেখানে হয় শুয়ে পড়ি—

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িয়া কহিল—তা হয় না। ডেকে তুলব কি, হঠাৎ যদি কেউ জেগে উঠে আমাদের দেখে ফেলে তা হলে সর্বনাশ, তা বুঝছেন না? কাল যদি এ অবস্থা জানাজানি হয়ে যায়, এ অঞ্চলে কোন বেটা আর মানবে? চলুন আর এক বাড়ি যাই। এবারে ফিরব না, এবারে নির্ঘাৎ—

হায় ভগবান!

ঘনশ্যাম বলিল—দূর নয়, কাছেই। আধ ক্রোশও হবে না—উঠুন।

ফের আধ ক্রোশ! আধ ক্রোশের কথা শুনিয়া শুনিয়া যে আর পারি না। আমি ছাঁচতলায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম, মরীয়া হইয়া বলিলাম —নায়েব মশায়, আর এক পা-ও যাচ্ছিনে। যা থাকে কপালে, এখানে হয়ে যাক। কোথাও না জোটে এই উঠোনেই শুয়ে পড়ব। কার মুখ দেখে যে কাশী থেকে বেরিয়েছিলাম!

ঘনশ্যাম চিন্তিত হইল। কহিল, ভারি মুশকিলে ফেললেন। কি করা যায়, তাই ত···আচ্ছা দেখি। বলিতে বলিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল—আসুন, হয়েছে—

জিজ্ঞাসা করিলাম—কতদূর?

—এই বাড়িতেই—নিতান্ত মন্দ হবে না।

ঢুকিতে হইল গোয়ালঘরে। গোরু এবং বাছুরে ঠাসাঠাসি, তিল ফেলিলেও বোধ হয় স্থানাভাবে গোরু-বাছুরের গায়ের উপর রহিয়া যাইবে। এবং গোবর ও গোমূত্র সহযোগে মেজের উপর এমন গভীর সুপবিত্র কর্দমের সৃষ্টি হইয়াছে যে তাহার মধ্যে কোথায় যে শুইতে হইবে ভাবিয়াই পাইলাম না।

কিন্তু শুইবার জায়গা ঠিক হইয়াছে নিচে নয়—ঊর্ধ্বলোকে।

আড়ার উপর বর্ষার জন্ত সঞ্চিত শুকনা বাঁশের চেলাকাঠ সাজানো, ঘনশ্যাম অবলীলাক্রমে খুঁটি বাহিয়া তাহার উপরে উঠিল। আমাকে কহিল—হাত ধরব নাকি?

হাত আর ধরিতে হইল না। স্বর্গারোহণ করিলাম। দেখি, সেখানেও সুখের অতি উত্তম ব্যবস্থা। মশা ভন-ভন করিতেছে, পিছনের ডোবা হইতে কোলাবেঙের একটানা আওয়াজ, ফুটা চাল হইতে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও যে গায়ে আসিয়া না লাগিতেছে এমন নয়। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, যদি ইহার একখানা বাঁশের চেলা এদিক-ওদিক সরিয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনে একটা রাত্রি অন্তত মহাদেব হইয়া গোপৃষ্ঠে চড়িয়া দেখা যাইবে।

ঠাণ্ডা বাতাস, সমস্তটা দিন মনের উপর দুশ্চিন্তা চাপিয়া ছিল, এতক্ষণে একটু চোখ বুজিলাম। ঘুমাইয়া পড়িতে দেরি হইল না। পরক্ষণে বাঁশ মচ-মচ করিয়া উঠিল। গ্রহের দৃষ্টি বুঝি কাটে নাই, ভাঙিয়া পড়ে নাকি? তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া দেখি—তাহা নয়, ঘনশ্যাম নামিয়া যাইতেছে।

কহিল—শুয়ে থাকুন, এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার কোথায়?

—কাছারিবাড়ি। বড্ড একটা ভুল হয়ে গেছে। যাব আর আসব। আপনি স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকুন—

ঘুম এমন আঁটিয়া আসিয়াছিল যে আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। তারপর আর কিছুই জানি না। জাগিয়া উঠিলাম যখন ঘনশ্যাম হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিতেছে—উঠুন, শিগগির উঠুন, ভোর হয়ে এল। কেউ না উঠতে কাছারির বিছানায় গিয়ে ভালমানুষের মতো শুতে হবে—

বাহিরে আসিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার—মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি কি-একটা তিথি। বিগতপ্রায় রাত্রির আকাশে পাণ্ডুর ক্ষীণ চাঁদ উঠিয়াছে। সাঁকোর উপর উঠিয়া ডান হাত দিয়া বাঁশ ধরিতে যাইতেছি, হাতের দিকে নজর পড়িতে চমকিয়া উঠিলাম—একি, রক্ত কোথা হইতে আসিল? দুপুর হইতে রক্তের বিভীষিকা দেখিতেছি, রাত্রির শেষ প্রহরে মুক্ত বিলের সীমানায় আমার সর্বাঙ্গ রক্তের আতঙ্কে থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম পিছনে ছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ঘনশ্যাম, দেখ, দেখ—আমার হাতে রক্ত এল কোত্থেকে?

চাহিয়া দেখি, ঘনশ্যামের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। জবাব কি দিবে, তাহারই কাপড়-চোপড়ে যেখানে সেখানে গাঢ় রক্তের মাখামাখি। কি-একটা অস্ফুট ভাবে বলিয়া তাহাই সে একনজরে দেখিতেছিল।

সাঁকো হইতে নামিয়া আসিলাম। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি? কি করেছ? আমায় সত্যি কথা বল—

ঘনশ্যামের কথা নাই।

তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া প্রচণ্ড নাড়া দিয়া কহিলাম—শুনতে পাচ্ছ? রাত্তিরে বেরিয়েছিলে—কার সর্বনাশ করে এলে?

জিভ দিয়া ওষ্ঠ ভিজাইয়া লইয়া কোন গতিকে সে কহিল—ও এমনি—

—এমনি-এমনি আকাশ ফুঁড়ে রক্ত এল? আজ পাঁচ-ছ দিন ধরে তোমার কাণ্ড দেখছি। মালিক আমরা, মুনাফা আমাদের—কথা বলতে পারিনে। কিন্তু এর কি সীমা নেই? কাল পুলিশ এলে আমি নিজে সাক্ষি দিয়ে তোমায় খুনী বলে ধরিয়ে দেব।

বলিতে বলিতে মনে হইল বুঝি বা কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ঘনশ্যাম এমনি করিয়া তাকাইল, যেন আমার কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কহিল—বাবু, ঠাণ্ডা হন—খুন হল কোথায় যে অমন করছেন ?

রাত্তিরে উঠে কোথায় বেরিয়েছিলে ? বলো—বলতে হবে—

এবার ঘনশ্যাম বিরক্ত হইল। কহিল—বলেছি ত—কাছারিবাড়িতে। এক-শ বার এক কথা। বলে, যার জন্যে চুরি করি—যাকগে, কর্তা নিজে যদি আসতেন আমার কদর হত। একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। ভুল-চুক কার না হয় মশায় ?

বলিয়া খালের কিনারায় হাত ও কাপড়ের রক্ত ধুইতে বসিয়া গেল। বলিল—আপনার হাতটা ধুয়ে ফেলুন, চিহ্ন রাখতে নেই। হাত ধরে আপনাকে ডেকে তুলবার সময় একটুখানি লেগে গেছে। যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—আগে টের পাই নি, এত রক্ত লেগেছে।

আমি কিন্তু অমন শান্ত হইয়া বসিয়া হাত ধুইতে পারিলাম না। বলিলাম—ঘনশ্যাম, কথাটা ভাঙছ না কেন ? কি করে এলে—বলো শিগগির।

ঘনশ্যাম কহিল—ভুল করে ফেলেছিলাম। থানায় এজাহার দিলাম, পাইকের পায়ে সড়কি মেরেছে। দারোগা জিজ্ঞাসা করল—কোন পায়ে ? বললাম—বাঁ-পায়ে। শুয়ে শুয়ে মনে হল, বাঁ-পায়ে তো নয়—ডান-পায়ে। ভাগ্যিস কথাটা মনে উঠল !

কহিলাম—ডান-পায়েই ত। রজনীর প্রাণটা যাচ্ছিল আর একটু হলে, চোখ মেলে ওর দিকে কি চেয়েও দেখনি একটা বার ?

ঘনশ্যাম বলিল—দেখেছিলাম বৈকি। সবই ঠিকঠাক লিখিয়ে দিয়েছি—কেবল ঐ একটা ভুল। ভুল আর কার না হয় বলুন—তবে বড় মারাত্মক ভুল। সকালে দারোগা আসবে তদন্তে—মামলা ফেঁসে

যাওয়ার জোগাড়। তাই রাত থাকতে থাকতে একবার নিজের চোখে দেখতে গেলাম।

কহিলাম—দেখে আর কি হল, গোলমাল যা হবার সে ত হয়েছেই।

—আজ্ঞে গোলমাল হবে ত এ অধীন আছে কি করতে? ভাবনা নেই, সব ঠিক করে দিয়ে এসেছি। রজনীর বাড়ি আপনি দেখেন নি। চার পোতায় মাত্র একখানা ঘর, সে ঘরের আবার সামনে বেড়া নেই। সুবিধে হল। গিয়ে দেখলাম, বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে—বৌটাও আর এক পাশে। ঠাউরে দেখি, জখম ডান-পায়েই বটে। তখন সড়কি দিয়ে বাঁ-পায়ে আবার একটু খুঁচিয়ে দিয়ে এলাম। বাবা গো—বলে যে-ই চেঁচিয়ে উঠেছে, আমি অমনি সুড়ৎ করে সরে পড়লাম।

বলিয়া ঘনশ্যাম নিজের চতুরতায় হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—ডবল সুবিধে হল মশায়। এই নিয়ে রাইচরণের নামে ফের আর এক নম্বর চালাব। এখন বাকি রইল, ডান-পা বাঁ-পায়ের গোল-মাল। আমি আগেই যাচ্ছি রজনীর বাড়ি, দারোগা জিজ্ঞাসা করলে যাতে বলে—দিনে মেরেছিল বাঁ-পায়ে, রাতে ডান-পায়ে। আজ আর রজনী হেঁটে কাছারি আসতে পারবে না। তা শুয়ে শুয়েই সাক্ষি দেবে।

অভিভূতের মতো শুনিয়া যাইতেছিলাম।

ঘনশ্যাম কহিল—কই, হল আপনার হাত ধোয়া? চলুন।

কাছারিবাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছি, এই সময়ে ঘনশ্যাম ডাইনের পথ ধরিল। বলিল—আপনি সোজা চলে যান—আমি রজনীর বাড়িটা ঘুরে এক্ষুনি যাচ্ছি।

কহিলাম—দাঁড়াও ঘনশ্যাম—

বোধকরি কণ্ঠস্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম—আমি আর থাকব না এখানে। এক্ষুনি কাশী চলে যাচ্ছি। তোমার ফেরবার আগেই রওনা হব। পয়লা মোটরে মধুগঞ্জে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

ঘনশ্যাম সন্ত্রস্ত হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল—আজ্ঞে, কি অপরাধ করলাম?

আমি বলিলাম—অপরাধের কথা নয়। আমি এ সব পেরে উঠছি নে, বাবাকে পাঠিয়ে দেব—তাতে কাজের সুবিধে হবে।

ইহাতে ঘনশ্যামের মতদ্বৈধ নাই, অতএব প্রতিবাদ করিল না, কেবলমাত্র কহিল—কিন্তু অন্তত আজকের দিনটে থেকে যান। দারোগাবাবু আসবেন—আমরা আইন-টাইন ত তেমন বুঝি নে।

বলিলাম—ফল তাতে বড় সুবিধে হবে না ঘনশ্যাম, দারোগার সামনে হয়ত কি বলে বসব, কেস মাটি হয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

বলিয়া হন-হন করিয়া পথটুকু পার হইলাম।

কাশী গিয়া বাবাকে যেই খবরটা জানাইয়াছি অমনি যেন বারুদে আগুন লাগিল। বলিলেন—যাক প্রাণ, রোক মান। তুমি কোন লজ্জায় পালিয়ে এলে বাপু? রাইচরণের মুণ্ডটা আনতে পারলে না, যেত দু-পাঁচ হাজার—যেত। আমার কি? আমার আর ক'দিন? চোখ বুঁজলে সব ফক্কিকার—

বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া খানিকক্ষণ বোধকরি সংসারের নশ্বরতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—এই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। নাগপুরেও যাচ্ছি নে—দেশেও না। বিষয়-আশয় কারবার-পত্তোর সব গোল্লায় যাক, কারো যখন গরজ নেই। আর যদি কোনদিন নড়ে বসি তা হলে—

একটা ভয়ানক রকমের শপথ করিতে গিয়া সামলাইয়া লইলেন। বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন, কারণ শপথ সন্ধ্যা নাগাদ ত ভাঙিতেই হইত!

বিকালবেলায় জিনিষপত্র গোছাইবার ধূম পড়িয়া গেল। আয়োজন গুরুতর। পাঁচজন পশ্চিমি গুণীলোক সঙ্গে যাইতেছে। আর যে কি-কি যাইতেছে তাহার সঠিক খবর বলিতে পারি না, আন্দাজ করা চলে। বলিলেন—না মরলে আমার অব্যাহতি আছে? ছাগল দিয়ে লাঙল চষা হলে লোকে আর ষাঁড় কিনত না—

ইঙ্গিতটা আমাকে উপলক্ষ করিয়া। কিন্তু অনর্থক। আমি ত কোনদিন ষণ্ডত্বের গৌরব করি নাই।

বাবা ততক্ষণে ট্রেনে চাপিয়া হয়ত মোগলসরাই পার হইয়া গেলেন। বীণা প্রশান্ত চোখ দু'টি আমার দিকে মেলিয়া শুইয়াছিল। আমি রজনী পাইকের গল্প বলিতেছিলাম। হঠাৎ সে চোখ বুঁজিয়া জড়সড় হইয়া মাথাটি আমার কোলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বলিল—তুমি থাম, আমার ভয় করে—

আমি কহিলাম—বীণা, তবু ত সে রক্ত তুমি চোখে দেখনি। বলির পাঁঠার রক্ত যে রকম গলগল করে বেরিয়ে আসে তেমনি—

বীণা কথা কহিল না। আলগোছে হাত দু-খানা বাহির করিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। চক্ষু তেমনি বোঁজাই আছে।

খানিক পরে চোখ মিট-মিট করিয়া চাহিয়া দেখিল, চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আমি কি করিতেছি। আর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর আবার চোখ বুঁজিয়া দিব্য ভালোমানুষের মতো ঘুমাইতে শুরু করিল।

বাবা ফিরিলেন দিন পনের পরে। আবার গেলেন। এমনি যাতায়াতে বছর খানেক কাটিল। আগে যে মুখ গম্ভীর বিমর্ষ থাকিত, ক্রমশ তাহাতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—ঘনশ্যাম খুব জাঁহাবাজ। টাকাকড়ি একটু এদিক-ওদিক করে বটে, কিন্তু ক্ষমতা আছে। ত্যাঁদোড় যে ক'টা ছিল, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে! মহল একেবারে যাকে বলে পায়রা-চোখো—

আমার কেমন ধারণা হইয়াছিল, রাইচরণ বাঁচিয়া থাকিতে বিবাদ মিটিবে না। বাবার সেই পাঁচ হাজারের বিনিময়ে মুণ্ড আনিবার আক্রোশটাও মনে ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—রাইচরণ মরেছে না দেশ ছেড়েছে?

বাবা কহিলেন—মরেও নি, দেশও ছাড়েনি। উচ্ছেদ করেছিলাম, তা বৌ-ছেলেপিলে নিয়ে কাছারি এসে পায়ে জড়িয়ে ধরল। ভাবলাম, চাষীদের মধ্যে সব চেয়ে মানীবংশ—যখন এতটা কাবু হয়েছে, যাকগে! পাইপয়সা না নিয়ে সেই মৌরশি পঁচিশ বিঘে কবলা করে দিয়ে গেল। আর ঘনশ্যামকে বলেছে ধর্ম-বাপ। এবার একবার গিয়ে দেখে এসো না। মাথা তুলে কথা কইবে তেমন বাপের বেটা ও-তল্লাটে কেউ নেই।

মধুসূদনকে মনে মনে স্মরণ করিয়া সভয়ে প্রার্থনা করিলাম, যেন দেখিয়া আসিবার প্রয়োজন সেবারকার মতো আর কখনো না হয়।

কিন্তু মধুসূদন সে প্রার্থনা শুনেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই কেবলমাত্র চোখের দেখা দেখিয়া আসা নয়—দেশে চিরস্থায়ী বসবাস করিবার প্রয়োজন ঘটিল। বাবা স্বর্গীয় হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারবারটিও। বীণা বাপের বাড়ি গিয়াছিল, মাকে শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে আনিয়া রাখিলাম। তারপর বাড়িঘর মেরামত

করিয়া বাসযোগ্য করিবার জন্য ঘনশ্যামের সুশাসিত নিরুপদ্রব মহলে অনেকদিন পরে আবার আসিয়া পৌঁছিলাম।

না, ইতিমধ্যে দেশের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে বটে! গঞ্জের আটখানা দোকানে টিনের চাল দিয়াছে। আধঘণ্টা অন্তর বাস,—কোন অসুবিধা নাই। বাসের ছাতের উপর বাক্স বোঝাই হইয়া শহরে মাছ চালান যায়। নূতন পোস্ট-অফিস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশের ভদ্রলোকেরা বন্দুক লইয়া বিলে পাখী শিকার করিতে আসেন। মাছ চালান দিতে অনেক বরফের দরকার হয় বলিয়া একটি আইস-ফ্যাক্টরি খুলিবার কথা হইতেছে। কোন একটা কোম্পানি জায়গাও দেখিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে তিনটি তাড়িখানা। এবার নাকি একটি মদের দোকানের ডাক হইবে। মোটের উপর সর্বরকমে সুবিধা—যা চাও তা-ই মিলিবে।

সর্বাগ্রে উঠানের জঙ্গলগুলি কাটাইবার দরকার। সকালবেলা ঘনশ্যামকে লইয়া নিজেই বাহির হইলাম—প্রাতর্ভ্রমণ হইবে, মজুরের তল্লাসও হইবে। কিন্তু মজুর পাওয়া কিছু কঠিন—অঞ্চলে মোটে চাষাভুষা নাই, তা পাইবে কোথায়? খালি খালি ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। দু-চারজন যাহারা আছে অবস্থা ভাল হইয়া গিয়া তাহারা আর মজুরি করিতে চাহে না। অবস্থা ভাল হইয়াছে, ঘনশ্যামের মুখে শুনিলাম। নিচু নিচু জীর্ণ কুঁড়েগুলি দেখিয়া মনে হয়, বইয়ে যে বীবরের বাসস্থান পড়িয়াছি তাহা বোধকরি এই প্রকার। ইহার মধ্যে মানুষ যে সত্যসত্যই ঘর-সংসার করিয়া বাঁচিয়া থাকে, আর তাহাদের ভাল অবস্থা হইয়াছে—চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস হইবার কথা নয়।

দুই জনের বাড়ি হইয়া তারপর গেলাম চরণ বেপারির বাড়ি। চরণ দেখি কাঁচের গেলাসে করিয়া কি খাইতেছে। ঘনশ্যামকে বলিল—নায়েব

মশায়, বিশ্রী অভ্যেস হয়ে গেছে। সকালে উঠে আগে চাই মিছরির পানা। নইলে মাথা ধরবে।

রোগ কঠিন বটে!

বলিলাম—ও চরণ, ভাল আছিস? আজকাল বেশ পয়সাকড়ি কামাচ্ছিস—না?

চরণ চিরদিনই বিনয়ী লোক। মুখখানা কাচুমাচু করিয়া জোড়হাতে বলিল—যে আজ্ঞে। লক্ষ্মীর কিরূপা মুখ ফুটে কি বলব,—আপনার মা-বাপের আশীর্বাদে হচ্ছে এক রকম। বাবু, এলেন কবে?

ঘনশ্যাম বলিল—বাবুরা সব দেশে-ঘরে চলে আসছেন। বাড়ির বাগান সাফ হবে। আজকে জোন খাটবি চরণ?

চরণ বলিল—খাটব। তারপর ঘাড়টা ডানদিকে কাত করিয়া আবার বলিল—খাটব। বাবুরা এসেছেন, খাটব না?—নিশ্চয় খাটব।

—তবে যাস সকাল-সকাল। বলিয়া বাহির হইলাম। পিছন হইতে ডাকিল—নায়েব মশায়!

দুজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

চরণ হাসিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে বলিল—একটা টাকা। জোনের দাম আগাম না দিতে পারেন চোটা হিসেবে দিন। দিন দু'পয়সা সুদ—যা রেট আছে। আজকের সুদ কেটে নিয়ে সাড়ে পনেরো আনাই দিয়ে দিন বরং—

ঘনশ্যাম কহিল—সকালবেলা টাকা কি হবে?

আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে চরণের বৌ মাথায় কাপড় টানিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠানের এককোণে বসিয়া ঝাঁট দিতেছিল। আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া চরণ কহিল—মাগীর বজ্জাতি। বলছে চাল বাড়ন্ত। সব চাল বেচে খেয়েছে, থাকবে কোত্থেকে?

এতবড় অভিযোগের পর লজ্জাবতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটা আরো একটু বাড়াইয়া দিয়া এক প্রকার স্বগত-ভাবেই বলিয়া উঠিল—বেয়াক্কিলে কথা। সব চাল বেচে খেয়েছে—কত চাল এসেছিল শুনি?

চরণ কহিল—কাল পাঁচসিকের মাছ বিক্রি হল তার হিসেব দে। দে শিগগির।

বৌয়ের হিসাব-জ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। অমনি মুখে মুখেই তৎক্ষণাৎ শুরু করিল—শোন্। চুরি করে খেয়েছি নাকি? এই সরু বালাম চাল দু-সের—ছ-আনা, ঘি—সাড়ে সাত আনা, মিছরি গরম-মশলায় হল সাত পয়সা আর রইল এক পয়সা,—তুই বললি নে যে এক পয়সা রেখে কি হবে—কপ্পূর কিনে নিয়ে আয়, জলে দিয়ে খাওয়া যাবে। সে কি আমার দোষ?

হিসাব পাইয়া চরণের আর কথা বলিবার উপায় রহিল না।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—কাল রাত্তিরে বুঝি কিছু হয় নি?

চরণ কহিল—না। কাল বড্ড পাহারায় ছিল। কোন দিন যে কি হবে, কিছু ঠিক করে বলবার যো নেই। তবে মোটের উপর ব্যবসাটা ভাল। বেশ আছি—কোন ঝক্কি নেই বাবা। মাঠের উপর হাঁটুজলে হৈ-হৈ করে গোরু তাড়িয়ে লাঙল চষে বেড়ানো—রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ও-সব কি আর পোষায়?

পথে আসিয়া চরণ বেপারির ব্যবসার কথাটা পাড়িলাম। কি এমন সুবিধাজনক ব্যবসা সে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে?

ঘনশ্যাম খুলিয়া বলিল। একা চরণ বেপারি নয়, চাষীদের মধ্যে যাহারা এখনো এ-অঞ্চলে টিঁকিয়া রহিয়াছে সকলেই ইহা ধরিয়াছে। ব্যবসাটা ভাল। রাত্রিবেলা ঘণ্টা তিন-চারের কাজ মোটে। সারা দিনমান সকাল

দুপুর সন্ধ্যা কখনও কোন পুরুষ-মানুষকে নড়িয়া বসিতে হয় না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দেখ—হয় ঘুমাইতেছে, নয় তাস খেলিতেছে, নয় ত তাড়ি খাইতেছে। দশটা বেলা না হইতেই সাবান ও গন্ধতৈল লইয়া দলে দলে পুকুরঘাটে নাহিতে বসে। চুল বাগাইয়া টেরি কাটিতে সময় কিছু যায়। গভীর রাত্রিতে গ্রামের মধ্যে যখন নিশ্চল নিষুপ্তি সেই সময়ে জাল ঘাড়ে কুঁড়ে হইতে টিপি-টিপি এক এক জন বাহির হইয়া পড়ে। পরস্পর ফিস-ফিস করিয়া কথা, ঝুপ করিয়া এক এক বার জাল পড়ার শব্দ···আবার ভোর হইবার আগে যে যার ঘরে ফিরিয়া আসে। জেলেদের পাহারার যে ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নয়, অতবড় সুবিস্তীর্ণ বিলের সবদিকে তাহারা নজর রাখিতে পারে না; আর ইহারাও সুযোগ-সন্ধান সমস্ত শিখিয়া ফেলিয়াছে। তবে নিতান্ত বে-কায়দায় পড়িলে পিঠের উপর কোন দিন দুই-এক ঘা যে না পড়ে তাহা নহে—কিন্তু তাহার বেশি আর কিছু নয়। দু-দশটা মাছ-চুরি জেলেরা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

সকাল হইতে কাজ মেয়েদের। মাছ গঞ্জে লইয়া বেচিয়া বাজার করিয়া যাবতীয় ঘরকন্নার কাজ সারিয়া রাঁধিয়া পুরুষ-মানুষদের ডাকিয়া তুলিয়া খাওয়াইতে হয়। তা মন্দ নয়, এরা আছে বেশ।

খালের জলে পা ধুইয়া উঠিব, খালধারের এক বাড়ির দাওয়া হইতে প্রবল চিৎকার আসিতেছে—নায়েব মশায়, ইদিকে—আমাদের বাড়ি একবার হয়ে যাবেন।

ঘনশ্যাম বলে—এই রে! চলুন—চলুন—

—ডেকে ডেকে গলা ভাঙছে। শুনে এসো না কি বলে।

ঘনশ্যাম বলিল—বদ্ধ পাগল। একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দ্রুত চলিতেছিল, পাগল দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আমাদের

পথ আটকাইল। আমকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। হাত জোড় করিয়া বলিল—ছোটবাবু পাড়ায় এলেন, তা আমার বাড়ি পদধূলি পড়বে না ?

ইহাকে চিনি ত। সেবার আসিয়া দেখিয়াছি, সুস্থ বলিষ্ঠ লোক। পাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, পাড়ার বিবাদ-বিসম্বাদে সালিশি করিত, চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ লিখিয়া দিত। এখন যেন একটি মড়া হাত-পা মেলিয়া বেড়াইতেছে।

ঘনশ্যাম বলিল—না খেয়ে শুকিয়ে নির্বংশ ভিটেয় পড়ে আছ, গড়ভাঙায় চেপে বোসো না কেন ? তারা যত্ন করছে—খাওয়া-পরা দেবে, দু'টাকা নগদ মাইনেও দেবে বলছে—

পণ্ডিত আমার দিকে চাহিয়া বলে—শুনুন হুজুর, পাগলের কথাবার্তা শুনুন। ভিন-গাঁয়ে গিয়ে পাঠশালা বসাব, ওদিকে যথাসর্বস্ব উচ্ছন্ন যাক। এঁদের তো তা হলে পোয়াবারো—

বলিয়া হা-হা করিয়া উচ্চহাসি হাসিতে লাগিল।

ঘনশ্যাম বিদ্রূপ করিয়া বলে—যথার মধ্যে ত ঐ ফুটো ঘর, আর সর্বস্বের মধ্যে ছেঁড়া দপ্তর—

পণ্ডিত এই কথায় জ্বলিয়া উঠিল।

—ছেঁড়া বলে নাক সিঁটকাচ্ছ ? ছেঁড়া দপ্তরে আমার লাখ টাকার দলিল, তা জানো ?

পাগল একেবারে আমার হাত ধরিয়া ফেলিল—আসুন হুজুর, আসতেই হবে আমার বাড়ি। মস্ত বড় উকিল আপনি, একবার এসে দেখে যান আমার দলিল। বলছে, কিছু নেই নাকি আমার ? বলছে, নির্বংশ ভিটে ? আসুন—আসুন—

সে কি টান! ঘোড়দৌড় করাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঘরের

ভিতর হইতে ছুটিয়া দলিলের দপ্তর আনিল। মলিন শতচ্ছিন্ন কাপড়ে বাঁধা। দপ্তর খুলিয়া এক একটা করিয়া কাগজ আমার হাতে দিতেছে। বলে—দেখুন, দেখছেন? কিচ্ছু নেই নাকি আমার? আপনি মনিব—আপনার নামেও মোকর্দমা করব, যা ছিল বিলকুল আবার ফিরিয়ে আনব।

সত্যই পুঁটিমারির বিলে অনেক জমি পণ্ডিতের। বিশ বছরের দাখিলা বাহির করিয়া দিল। যেবার অজন্মা গিয়াছে, খাজনা দিতে পারে নাই—পরের বৎসরের সুদ-খেসারত দিয়া খাজনা শোধ করিয়াছে।

ঘনশ্যাম বলিল—এত কাল না হয় দিয়েছ মানি। কিন্তু এই পাঁচ বছর—বিলডুবি হয়ে গেল যেখান থেকে? বাকি খাজনায় নিলাম হয়ে গেছে তোমার জমি, এস্টেট থেকে কিনে নিয়েছে। পচা দাখলেয় তা ফিরবে না। ফেলে দাও—ফেলে দাও—ও সব পুড়িয়ে ফেল—

রুষ্ট চোখে তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া পণ্ডিত দলিলের পর দলিল বাহির করিতে লাগিল। তারপর একগাদা চিঠি। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, প্রাইভেট চিঠিপত্র—এগুলো আলাদা করে রাখবেন পণ্ডিত মশায়—

দৃঢ়কণ্ঠে পণ্ডিত বলে—এ-ও দলিল আমার, বিষম দলিল—রেখে দিয়েছি, মোকর্দমা করব—

বড় মেয়ে বিজয়ার পর শ্বশুরবাড়ি হইতে প্রণাম জানাইয়া পোস্টকার্ড দিয়াছে···কুশখালি হইতে লিখিয়াছে, কুটুম্বের দল সদলবলে ছেলের পাকা-দেখা দেখিতে আসিতেছে·· নাতির অন্নপ্রাশনে পণ্ডিতের স্বহস্তে লেখা কালির নিমন্ত্রণপত্র খান দুই বাড়তি ছিল, তাহাও রহিয়াছে···অজস্র ভুল-বানানে কাঁচা হাতের লেখা একখানা খামের পত্র—কোন এক নূতন বউ বরকে পাঠ দিয়াছে 'প্রাণেশ্বর'···

পাগল পণ্ডিত সগর্বে বলে—দেখবেন ? কিচ্ছু নেই নাকি আমার ? ঘনশ্যামের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অতিযত্নে সে দপ্তর বাঁধিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে রাইচরণের বাড়ি। সেই রাইচরণ দাস, যাহার মুগুরের প্রতি বাবার অত আগ্রহ ছিল।

ঘনশ্যাম বলিল—যাবেন ওর বাড়ি ? আজকাল মজুরি খাটে।

আমি বলিলাম—বেলা হয়ে গেছে, আজ থাক।

ঘনশ্যাম বলিল—না' না—দেখে যাই, চলুন। উঠানে গিয়া ডাকিল—রাইচরণ ? ও রাইচরণ!

লম্বা-চওড়া বিশাল দেহ লইয়া সামনে দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে, তবু উত্তর দিবে না। বেটা মরিয়া গেল নাকি ?

কিন্তু গরজ আমার, ডাক দিলাম—ও রাইচরণ, অসুখ করেছে ?

এবার অস্ফুট সাড়া আসিল—উঁ—

বলিলাম বেলা দুপুর হয়ে গেছে, এখনো ঘুমুচ্ছ ?

চোখ দুইটা মেলিয়া আমার দিকে তাকাইল, টকটকে রাঙা যেন দু'টি গুলি। দেখিয়া ভয় করে। একেবারে মানুষের মতো রাইচরণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঘনশ্যাম বলিল—আকণ্ঠ তাড়ি গিলেছিস বুঝি ? আজকে জোন খাটতে যাবি ?

যাব—বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সে ঘুমাইতে শুরু করিল।

বেলা বাড়িতেছিল, ইহার কাণ্ড দেখিয়া আর রাগের সীমা রহিল না। ঘনশ্যামকে বলিলাম—চল, যাওয়া যাক। বেটা মাতাল—

কথাটা রাইচরণের কানে গিয়াছিল—ধীর গম্ভীরভাবে উঠিয়া বসিল।

তারপর একখানা পা বাড়াইয়া দিয়া কোণের চাউলের কলসিটায় ঠন করিয়া লাথি মারিতেই ভিতর নড়িয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িয়া কহিল—না, আমি যাব না।

ঘনশ্যাম কহিল—ঘরে চাল আছে, আর কি বেটা নড়বে? চলুন—

রাইচরণও হাত নাড়িয়া আমাদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—গতর খাটানো ছোট কাজ, ও-সব আমি করিনে—

দিন পনেরোর মধ্যে বাড়ির জঙ্গল একদম সাফ হইয়া গেল, আবার শ্রী ফিরিল। চার-পাঁচটা কুঠরির চুণকাম করিয়া একেবারে নূতনের মতো হইয়াছে, আর-আর যাহা কাজ আছে ধীরে-সুস্থে পরে করিলেই চলিবে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া গেল, আষাঢ়ের প্রথমেই নূতন সংসার পাতিবার আর কোন বাধা নাই। একদিন বিকালে সাগরগোপের ইস্কুলঘরের কাছে বল্লভ রায়ের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আগে শ্যামবাজার শ্বশুরবাড়ি হইয়া যাইবে। বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না, বাস আসিল। গাড়িতে উঠিয়া দিব্য আরাম করিয়া গদির উপর বসিলাম। আর একদিন ছেলেবয়সে ছোটকাকার বিয়েয় এই পথে কত দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হইয়াছিল। দেশের কি আর সেদিন আছে?

তীরের মতো ছুটিয়া চলিয়াছি। দূরের গ্রাম হইতে এক পাল গোরু চরাইয়া রাখালেরা ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হর্ন বাজাইতে বাজাইতে পালের মাঝখান দিয়া চলিল। এ পথে এমন হইয়াছে যে গোরুগুলো পর্যন্ত আজকাল মোটরগাড়ি ভ্রূক্ষেপ করে না।

মুক্ত বিলের বাতাসে রাস্তার দুই পাশে ছলছল শব্দে জলের আঘাত লাগিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলি সীমাহীন জলরাশি।

জলের মধ্যে এখানে সেখানে তাল ও শিমূল গাছ। চারিদিক অন্ধকার করিয়া মেঘ জমিয়া আসিল। দু-একটি লোক ছাতা খুলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, হেড-লাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে, চতুর্দিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে মোটর-এঞ্জিনের একটানা আওয়াজ।

মাঝে মাঝে পথ গিয়াছে সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া। বাঁক ফিরিবার মুখে গাড়ির তীব্র আলো এক একবার জলের উপর পড়ে। বল্লভ রায়ের উঁচু পাকা রাস্তা—মানুষের ঘরবাড়ি ডুবিয়া যায়, কিন্তু রাস্তার উপর জল উঠে না। মোটর হর্ন বাজাইয়া নির্বিঘ্নে ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় আসিয়া গাড়ি থামিয়া গেল। ড্রাইভার নামিয়া পড়িল, ম্যাগনেটে কি দোষ হইয়াছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হইয়া যাইবে। যাত্রীরাও সকলে নামিয়া পড়িলাম। গাছটিকে চিনিলাম —অশ্বত্থগাছ। সামনেই নূতন পুল। দেখিতে দেখিতে পিছন হইতে তিনখানা বাস পর পর আমাদের পাশ কাটাইয়া আগে চলিয়া গেল। উজ্জ্বল আলোকে অশ্বত্থগাছের আগাগোড়া, টার্নার-ব্রিজ এবং রাস্তার বহুদূর অবধি উদ্ভাসিত হইল। এই অশ্বত্থগাছের তলা দিয়া লক্ষ টাকা দিলেও কেহ যাইতে চাহিত না। আজ আর সেদিন নাই। গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে গাড়ি চালাইবার কোন অসুবিধা না হয়।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল, কিন্তু আমাদের গাড়িখানি যেমন স্থাণু হইয়া ছিল, তেমনি রহিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রিজের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। নিম্নে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া পুঁটিমারি বিলের সুবিপুল জলরাশি বাহির হইবার চেষ্টায় পাক খাইয়া প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে। লোহার কপাট ফেলা আছে। জলের এমন উন্মত্ত গর্জন, যেন একসঙ্গে সহস্র মানুষ ঐ লোহার কপাটে

মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছে। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, এমনি একাগ্রে যদি নিশীথ রাত্রি অবধি কান পাতিয়া থাকিতে পারি, তবে নিশ্চয় জলের ভাষা বুঝিতে পারিব। বহুকাল পূর্বে এক নিরীহ ঘুমন্ত শিশুর রক্ত দিয়া এখানে বাঁধ বাঁধা হইয়াছিল, জলস্রোত সে বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এবার গভর্নমেণ্ট বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার লাগাইয়া লোহালকড়ে অপূর্ব সেতু বাঁধিয়াছেন—নিস্ফল আক্রোশে বিলের জল গর্জন করিয়া মরিতেছে, সেতুর একটা লোহাও ঢিলা করিতে পারে না।

সেকালের নর-বাঁধের কথা মনে পড়িল, ছোটকাকার বিয়ের কথা মনে পড়িল, দ্বারিক দত্তর কথা মনে পড়িল। একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় গামছা পরিয়া কোমরজল ভাঙিয়া এই বাঁধ পার হইতে হইতে বলিয়াছিলেন—সহস্র নরবলি না হইলে এই খাল নাকি বাঁধা হইবে না। মিথ্যুক বুড়া। খাল বাঁধা হইয়া গিয়াছে, সহস্র বলি হইল কই ?

বরঞ্চ দেখি, দেশের দিন ফিরিয়াছে—চারিদিকে আনন্দ—হাসি! জলের শব্দে যেন উচ্ছল হাসির শব্দ শুনিতে লাগিলাম। চরণ বেপারি হাসিয়া বলিতেছে—হেঁ—হে—সকালে উঠে মিছরির পানা আগে চাই। রাইচরণ পা দিয়া চালের কলসি নাড়িয়া দেখিতেছে, ঠন-ঠন করিয়া বিলের জলের মধ্যে যেন সেই কলসির আওয়াজ হইতে লাগিল। তাড়ি খাইয়া পাঁচু মণ্ডল, রাখু, বিশে সকলে যেন হল্লা করিয়া কোমরে হাত দিয়া ঐ জলের মধ্যে বাইনাচ করিতেছে, আর বলিতেছে—বেশ আছি··· বেশ আছি···ঝক্কি নেই, খাসা আছি—

একজন সহযাত্রী আমার দিকে আসিলেন। কহিলেন—বড় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—এই যা। নইলে, নর-বাঁধ বেড়াবার বেশ জায়গা—

আমি বলিলাম—নর-বাঁধ বলছেন কাকে ? সে-সব আর নেই এ হল টার্নার ব্রিজ—

—একটা পয়সা—

কে রে ? তাকাইয়া দেখি, অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট একটি ছেলে আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম—এইটুকু ছেলে তুই, এখানে কোত্থেকে এলি ?

জবাব না দিয়া ছেলেটি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর মুখ ফিরাইয়া দেখি, একটা দু'টা নয়—পিঁপড়ার সারির মতো অশ্বত্থতলা দিয়া ছায়াচ্ছন্ন অনেক মূর্তি আসিতেছে—গণিয়া শেষ করা যায় না এত। বিলের কোন নিনিরীক্ষ প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইয়া একে একে টার্নার-ব্রিজের উপরে তাহারা উঠিতে লাগিল। কঙ্কালসার দেহ—প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ—কলের পুতুলের মতো আমাদের সামনে আসিয়া নিঃশব্দে হাত পাতিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। শিহরিয়া উঠিলাম। সহযাত্রী মহাশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন—দেখছেন কি, এই হয়েছে বেটাদের পেশা। ঐ সব গ্রামের লোক,—গ্রাম-ট্রাম আর নেই, তাই রাস্তার ধারে বসতি। চুরি-চামারি করে বেড়াবে—আর একটা লোক পেলে যেন ছেঁকে ধরবে মশায়। হারামজাদাদের পুলিশেও ধরে না—

অকস্মাৎ সেই কৃষ্ণ ছায়াগুলি কথা কহিয়া উঠিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—কিন্তু সেই ছলছলায়িত বিলের প্রান্তে ঘনান্ধকার বর্ষা-রাত্রির উন্মুক্ত শীতল বায়ু-প্রবাহের মধ্যে আমার মনে লইল, ইন্দ্রিয়াতীত অশরীরী জগৎ হইতে রক্ত-মাংসের মানুষের উদ্দেশে শত সহস্র প্রেতমূর্তি হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। কি তাহারা বলিল, বহু জনের সমবেত কাকুতির মধ্যে তাহার একবিন্দু বুঝিলাম না, শুধু মাথা হইতে পা

অবধি বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো সুতীব্র কম্পন বহিয়া গেল। হঠাৎ মোটর হইতে তীব্র আলো জ্বলিল, কল ঠিক হইয়া গিয়াছে। ড্রাইভার চিৎকার করিয়া উঠিল—রাস্তা ছাড়্, তফাৎ যা, তফাৎ—

মূর্তিগুলি ছুটাছুটি করিয়া রাস্তার নিচে যে অদৃশ্য প্রান্ত হইতে বাহির হইয়াছিল, মুহূর্ত মধ্যে সেখানে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আবার দ্বারিক দত্তর কথা মনে পড়িল। দাড়ি নাড়িয়া তিনি কি বলিতেছেন। বুড়া মারা গিয়াছেন বছর আষ্টেক আগে। ভাবিলাম, বুড়াকে মিথ্যুক বলিয়াছিলাম—প্রেতভূমি হইতে তাই কি ডজন পাঁচ-ছয় আমদানি করিয়া বলির নমুনা দেখাইয়া গেলেন?

মাথুর

*

মাসখানেক মাত্র নিরুদ্দেশ থাকিয়া উমানাথ বাড়ী ফিরিয়াছে কাল রাত্রে। এত শীঘ্র ফিরিবার কারণ, মাঠবাড়িতে মেলা লাগিয়াছে, ভাল ভাল কীর্তনিয়ারা আসিয়াছে, বিশেষ করিয়া এবার সোনাকুড়ের বালক-সঙ্কীর্তনের আসিবার কথা। খবরটা কাকপক্ষীর মুখে কি করিয়া তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল।

বড় ভাই ক্ষেত্রনাথ দাওয়ায় বসিয়া সকালবেলায় মিষ্ট রোদ সেবন করিতে করিতে একখানা দলিলের পাঠোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। দলিলটি বহু পুরানো, পোকায় কাটা, জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া এমন পাকাইয়া গিয়াছে যে, এক একটা জট খুলিতেই একটি বেলা লাগে।... উমানাথ সোজা সেইখানে উঠিয়া তড়বড় করিয়া আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিল।

বিস্মিত চোখে ক্ষেত্রনাথ একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন। কথা শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন—জগদ্ধাত্রীর বাড়ী কবে গিয়েছিলে?

—কুড়ি-বাইশ দিন আগে।

—হৃদয় ছিল সেখানে?

—না।

হুঁ—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপ করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর হাতের দলিল সযত্নে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বলিলেন—আমি জগদ্ধাত্রীর চিঠি পেয়েছি পরশুদিন! এখন তোমার ঐ বিশ দিনের বাসি খবর শুনে লাভালাভ নেই—

দলিল বাক্সবন্দি করিয়া ধীরে সুস্থে পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি তামাক ধরাইয়া বসিলেন। এবার বলিবার পালা তাঁহার। কণ্ঠ চিরদিনই প্রবল, আজও তাহার অন্যথা হইল না। বাক্যের তূণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেলে ক্ষেত্রনাথ অন্য কাজে চলিয়া গেলেন, তাহার পরেও উমানাথ সেখানে একই ভাবে বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে বাড়ির মধ্যে গিয়া তরঙ্গিণীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তরঙ্গিণী ভালমানুষের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?

অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় কিস্তি। উমানাথ চুপ হইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী আবদারের ভঙ্গিতে মোলায়েম সুরে বলিতে লাগিল—তা বল, বল না গো—মেয়েমানুষ, ঘরের কোণে পড়ে থাকি, কামাই-ঝামাই করে এলে এদ্দিন পরে, ভালমন্দ কত কি নিয়ে এলে, দেখে এলে, শুনে এলে—বল না দুটো কথা, শুনি—

উমানাথ বলিল—জগদ্ধাত্রী-দিদি ওঁরা দেশে ঘরে ফিরেছেন, তাই বলছিলাম দাদাকে—

—শুক্‌কন্তে ? মস্তবড় খোশখবর, গামছা বখশিস দিই ? তরঙ্গিণী হাসিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। গামছা হাতে সে মাথা মুছিতেছিল, সেটাকে পরম পুলকে সে স্বামীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—পুরুষের ত মুরোদ হল না যে জন্মের মধ্যে পরিবারের হাতে একটা কিছু দিই এনে···তা আমি দিচ্ছি এই গামছাখানা বখশিস—

মনে মনে আহত হইয়া উষ্ণকণ্ঠে উমানাথ বলিল—গামছা বখশিস কেউ আমায় দেয় না—

তরঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইল—না, তা-ও দেয় না।

হাসিয়া কহিতে লাগিল—গামছা ত দেয় না, উত্তম-মধ্যম দেয় কি-না বোলো ত একদিন—

উমানাথ এ কথায় একেবারে ক্ষেপিয়া গেল।

—মহামিথ্যুক তোমরা। বখশিসের কত শাল-দোশালা এনে দিয়েছি এ-যাবৎ, তবু বার বার ঐ কথা। উত্তম-মধ্যম দেয়···দিলেই হল অমনি! ডাকো দিকি দশগ্রামের সভা, ডাকো একবার এদিককার যত কবিওয়ালা।

বলিতে বলিতে উত্তেজনার মুখে কবিতা বাহির হইয়া আসিল—

হরেক কবি হরবোলা
সবার উপর ময়রা ভোলা,
তাঁর শিষ্য সহায়রাম,
গুরুর পায়ে কোটি প্রণাম—

গুরু সহায়রামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবশেষে সে কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবিন্দু রাগ করে নাই, তেমনি হাসিভরা মুখ। খানিক পরে উমানাথের রাগ পড়িয়া আসিলে পুনরপি প্রশ্ন হইল—ঠাকরুণের ওখানে স্থিতি হয়েছিল ক'দিন, ওগো?

উমানাথ সদম্ভে বলিতে লাগিল—ক'দিন আবার, যাবার পথেই পড়ল বলেই ত! দলের সমস্ত লোক হাটখোলার পাশে উনুন খুঁড়ে নিল, আমি ত আর তা পারিনে? হাজার হোক পজিশন আছে একটা—

বলিয়া পজিশন মাফিক গম্ভীর হইল।

তবু তরঙ্গিনী সমীহ করিল না। বলিল—তা জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, পজিশনটা টিঁকল কি করে? অতিথ বলে হাতজোড় করে গিয়ে তাঁর উঠোনে দাঁড়ালে?

কথাবার্তার ধরণে মনে মনে শঙ্কিত হইলেও উমানাথ মুখের আস্ফালন ছাড়িল না।

—আমার বয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা হল, তারপর আমারই হাত ধরে টানাটানি। সে কি নাছোড়বান্দা! কিছুতে শুনবেন না—

—তারপর?

—তারপর বিরাট আয়োজন: জগদ্ধাত্রী-দিদি আর বাকি রাখেন নি কিছু। দুধ-ঘি সন্দেশ-রসগোল্লা মাছ-মাংস বাটির পর বাটি আসছে পাতের ধারে। ফুরোয় না—

গম্ভীর কণ্ঠে তরঙ্গিণী কহিল—খাওয়া-দাওয়ার পরে?

উমানাথ চমকিয়া গেল। ঝড় প্রত্যাসন্ন! সে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আবশ্যক হইল না। ছোটবৌ আসিয়া ঢুকিল; তার পিছনে মেজবৌ। দু'টিই অল্পবয়সি। ক্ষেত্রনাথের মেজ ও ছোট ছেলের বৌ। বিয়ে এই বছর দুই-তিন মাত্র হইয়াছে।

জলচৌকির পাশে তেলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া ছোটবৌ বলিল —নাইতে যান কাকাবাবু, রাত্তিরে ত উপোস করে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তা, আমাদের ডাকতে পারলেন না—এমনি আপনি। একদৌড়ে নেয়ে আসুন—নয় ত দেখবেন কি করি—

এই বলিয়া দু'টি বৌ মুখোমুখি চাহিতেই ছোটবৌ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেয়াপাড়া-জাগুলগাছি অঞ্চলে যাঁহাদের গতায়াত আছে, উমানাথ চাটুজ্জে অর্থাৎ ছোট চাটুজ্জের পরিচয় তাঁহাদিগকে দিবার দরকার নাই। বর্ষার সময়টা এই সর্বসমেত মাস চারেক বাদ দিয়া বাকি দিনগুলি ছোট চাটুজ্জের দলের পাওনা লাগিয়াই আছে। দলটা কিন্তু হিসাবমতো

উমানাথের নয়, সে বাঁধনদার মাত্র। এবং রাহাখরচ ও টাকাটা-সিকিটা ছাড়া প্রাপ্তিও এমন কিছু নাই। তাই ঘর-বাহিরের ক্রমাগত হিতোপদেশ শুনিতে শুনিতে এক এক সময়ে উমানাথ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, ছোট লোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া বেড়াইয়া পিতৃপুরুষের মান-ইজ্জত যা ডুবিয়াছে তা ডুবিয়াছে—আর ডুবাইবে না। দিন কতক বেশ চুপচাপ কাটিয়া যায়, সে দিব্য বাড়ি বসিয়া খাইতেছে, বেড়াইতেছে, ঘুমাইতেছে,—হঠাৎ কেমন করিয়া খবর উড়িয়া আসে, অমুক গ্রামে ভারি হৈ-চৈ—তিন দলে কবির লড়াই, কাত্তিক দাস তার শিষ্য অভয় চরণ আর বেহারী ঢুলিকে লইয়া পূব অঞ্চলের সমস্ত বায়না ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরদিন সকাল হইতে আর ছোট চাটুজ্জের সন্ধান নাই, খেরো-বাঁধা খাতাখানাও ঐ সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে।

বিকালের দিকে মঠবাড়ি হইতে খোলের আওয়াজ আসিতে উমানাথ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া চাদর কাঁধে ফেলিল। বগলে যথারীতি গানের খাতা রহিয়াছে।

—দাঁড়াও ছোটদাদু, আমি যাচ্ছি।

ছ-সাত বছরের নিতাইচন্দ্র, কাল মারামারি করিতে গিয়া ফুলপাড় শৌখিন ধুতিখানার ক'জায়গায় ছিঁড়িয়া আসিয়াছে, তরঙ্গিণী তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়াছে। উবু হইয়া বসিয়া বসিয়া নিতাই মনোযোগের সঙ্গে শিল্পকার্য দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আজকে আর থাক রাঙাদিদি, উ-ই দাও। ছোটদাদু মেলায় যাচ্ছে, আমি যাব—

তরঙ্গিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—যাও ভাই। ছোটদাদু সন্দেশ কিনে খাওয়াবে।

তারপর তরঙ্গিণী নাতিকে কাপড় পরাইয়া সুন্দর করিয়া কোঁচা

দিয়া দিল। গায়ে পরাইয়া দিল সবুজ একটি ছিটের জামা। ফুটফুটে মুখখানি অতি যত্নে আঁচলে মুছাইয়া মুগ্ধচোখে কহিল—বর-পত্তোরটি চলছেন। বৌ নিয়ে আসা চাই কিন্তু নিতু বাবু।

উচ্ছ্বসে কিল তুলিয়া নিতু বলিল—বুড়ী!

—বুড়ী বলেই ত বলছি মাণিক। কাজ করতে পারিনে, তোমার কাকীরা মনে মনে কত রাগ করে। এমন বৌ নিয়ে আসবে যে দু'বেলা আমাদের কাজকর্ম রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, কোলে করে সকাল-বিকাল তোমায় পাঠশালায় দিয়ে আসবে। কেমন?

নিতু লজ্জা পাইয়া একদৌড়ে পলাইয়া গেল।

তারপর হাসিতে হাসিতে উমানাথের দিকে ফিরিয়া বলিল—তুমিও একটা জামা গায়ে দাও। শীতের দিন—এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না গো—

উমানাথের অত অবকাশ নাই। কাঁধের চাদরের উপরেই একটা কামিজ ফেলিয়া সে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে তবু বাধা।—শোন—

তরঙ্গিণী কহিতে লাগিল—ভাসুর ঠাকুর খেতে বসে বড্ড দুঃখ করছিলেন। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলছিলেন—

ভূমিকার রকম দেখিয়া উমানাথের মুখ শুকাইল। এক কথায় হাঁ-না করিয়া সরিয়া পড়িবার ব্যাপার ইহা নহে। ওদিকে খোল-করতালের ধ্বনি ক্ষণপূর্বে থামিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা সারা হইয়া নিশ্চয় এবার পালা আরম্ভ হইল।

তরঙ্গিণী বলিল—তুমি সাতেও থাক না, পাঁচেও থাক না। অমন দাদা—বাপের মতন বললেই হয়—তাঁর সঙ্গে এসবের কি দরকার ছিল বল ত?

উমানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। সহায়রামের ভিটে থেকে এক সরষেই বিক্রি হয় বছরে কত টাকার? এতকাল জগদ্ধাত্রী-দিদি বিদেশে পড়ে ছিলেন, নিতে-থুতে আসেন নি—এখন কিছু না দিলে চলবে কেন?

তরঙ্গিণী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল—এই যুক্তিগুলো কার শেখানো? জমাজমি আমাদের কি আছে না আছে—কোন দিন তুমি চোখ মেলে দেখেছ, না খবর রাখ? জগদ্ধাত্রী-দিদির মায়ায় আজ বড্ড টনক নড়ল। আর তা-ও বলি, অনাথা বিধবা মানুষ তোর আপনার পেটে ভাত জোটে না, নেমন্তন্ন করে চর্বচোষ্য খাইয়ে এই যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঘর ভাঙবার মতলব—এ দুষ্টবুদ্ধি কি জন্যে তোর?

কিন্তু শেষ কথাগুলি উমানাথ বোধ করি শুনিলই না। সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিতে লাগিল—সত্যি বৌ, দিদি বড্ড অনাথা, সত্যিই তাঁর পেটে ভাত জোটে না। সমস্ত শুনেছ তা হলে? কোত্থেকে শুনলে?

তরঙ্গিণী আঙুল তুলিয়া দেখাইল।

—ঐ ভাঙা দেরাজটা খুলে দেখ। দেশে এসেছেন শ্রাবণ মাসে সেই অবধি হপ্তায় হপ্তায় চিঠি। হৃদয় ঠাকুর-পো পৈতৃক শত্রুতা সাধতে লেগেছে, ও-ই হয়েছে আজকাল মন্ত্রী। সে যা শিখিয়ে দেয়, ঠাকরুণ তাই লেখেন।

উমানাথে আর্দ্র স্বরে বলিল—কিন্তু অবস্থা দিদির সত্যিই বড় খারাপ। সাক্ষি আমি নিজে। নিজের চোখে দেখে এসেছি। দেখে জল আসে চোখে।

—তারই মধ্যে ত এই নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ—দুধ-ঘি মিষ্টি-মেঠাই। বুঝতে পার? ওগো বুদ্ধিমন্ত মশাই, মানে বোঝ এর? তরঙ্গিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

—কিছু না, কিছু না। উমানাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিতে লাগিল—সমস্ত বাজে কথা বৌ, আমি ওর বাড়ি নিজেই গেছলাম। খেতে বসেছি হঠাৎ বৃষ্টি এল। তারপর বাইরের বৃষ্টি থামল ত ঘরের বৃষ্টি আর থামে না। ভাতের থালা নিয়ে কোথায় গিয়ে বসি—লজ্জায় দুঃখে দিদি মুখ তুলতে পারেন না। আর সেই মোটা মোটা বীরপালা চালের ভাত—সহায়রাম রায়ের মেয়ে, গুরু সহায়রামকে গড় না করে তিনটে জেলার কেউ কবির আসরে নামতে সাহস করে না—তাঁর মেয়ের এই রকম হাল! বলিতে বলিতে উমানাথের কণ্ঠ ভারি হইয়া আসিল! হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জামাটা পরিয়া লইবার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল।

গান চলিতেছে।

বকুল ও মাধবীলতার কুঞ্জবন, তাহারই পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মূল-গায়েন মুখরা বৃন্দাদূতীর বিদ্রূপ-বাণী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—বৃন্দা কহিতেছে—সুখে আছ ত মথুরার রাজা? তোমার নব-সঙ্গিনীকে পাশে লইয়া ত্রিভঙ্গ ঠামে একবার দাঁড়াও—দেখি, বাঁকা-শ্যাম আর কুব্জা-নায়িকায় মিলিয়াছে কেমন? মনে কি পড়ে বন্ধু, কোথায় কবে এক রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাইত—আর কাঞ্চন-লতা কুলের বধূ কুল ভাসাইয়া কলসি ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিয়া পায়ে লুটাইত? আজিকার এই সুখবাসরের মধ্যে গন্ধদীপের আলোয় হঠাৎ যদি একটি ম্লান মুখচন্দ্র তোমার মনের দরজায় সসঙ্কোচে পলকের জন্য তাকাইয়া যায়, তাহাকে দূর করিয়া দিও মহারাজ, দুঃস্বপ্নকে মনে ঠাঁই দিতে নাই...

শ্রোতাদের মুখে মুখে ম্লান হাসি। যুগান্ত-পারের একটি সর্বব্যাপী বিরহ-ব্যথা গানের সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শীতক্লিষ্ট ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সকলের বুকের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। উমানাথ

তদ্‌গত হইয়া শুনিতেছিল। নিতাই ফিস-ফিস করিয়া ডাকিল—ছোটদাদু!

উমানাথ কহিল—চুপ!

মিনিট কতক চুপ করিয়া নিতাই ছেঁড়া কানাতের ফাঁকে আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে কত কি বকিতে বকিতে আঙুল ঘুরাইতে লাগিল। আবার প্রশ্ন করিল—শোন ছোটদাদু, জয়ন্তী বলে কি, আগে নাকি আকাশ হাতে পাওয়া যেত—একদিন এক বুড়ি ঝাঁটার বাড়ি দিয়েছিল—সত্যি?

উমানাথ টানিয়া তাহাকে আরও কোলের কাছে আনিল।

ঐ শোন্ খোকা, গান শোন।

—না, বাড়ি চল।

মুখ না ফিরাইয়া উমানাথ বলিল—হুঁ—

আরও খানিক বসিয়া থাকিয়া নিতাই আস্তে আস্তে সামিয়ানার বাহিরে আসিল। তাকাইয়া দেখিল, ছোটদাদু কিছুই টের পায় নাই, তেমনি এক মনে গান শুনিতেছে।

গায়ক তখন গাহিতেছে—

ওগো মাধব, গোকুলে চাঁদ ওঠে না, ভ্রমরের গুঞ্জন নাই, যমুনা কলধ্বনি ভুলিয়া গেছে, আর তোমারি গরবিনী রাই আজ ধূলায় পড়িয়া আছে। দশমী দশায় কণ্ঠ তাহার নিরুদ্ধ, শ্বাস বহে কি না বহে। কবরী খুলিয়া পড়িয়াছে, চোখের জলে শতধারা নদী বহিতেছে; সখীরা তাহাকে ঘিরিয়া তোমার নাম কত শোনায়, ক্ষীণ কাঞ্চন-রেখা তনু ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে—কিন্তু চোখ মেলিবার ক্ষমতা নাই। অভাগিনী এতদিনে মরিয়া জুড়াইল বুঝি!

কৃষ্ণ অভয় দিলেন—ভয় করিও না। সখি বৃন্দে, তোমাদের কিশোর রাখাল আবার ফিরিয়া যাইবে...

একজন দোয়ার আসরের পাশে সরিয়া তামাক খাইতেছিল, হাত নাড়িয়া উমানাথকে কাছে ডাকিল। কহিল—কেমন গান শুনছেন ছোট চাটুজ্জে মশাই ?

উমানাথ বলিল—খাসা।

উঁহু—বলিয়া লোকটা ঘাড় নাড়িল। বলিল—আরে মশাই, মাথুর পালা হল এর নাম—চোখের জলে এতক্ষণ সতরঞ্চি ভিজে যাবার কথা। এ পালা বিচ্ছু বাঁধতে পারে নি। আর এ যা শুনলেন, শুনলেন ; শেষটা একেবারে বিচ্ছু হয় নি। আপনাকে মশায়, পালাটা আগাগোড়া একবার ঠিক করে দিতে হবে। কর্তাবাবু বলেছিলেন আপনার কথা—

উমানাথ ঘাড় নাড়িল।

ইতিমধ্যে নিতাই ছুতারপটি লোহাপটি তরকারির হাট পার হইয়া সার্কাসের তাঁবুর চারিদিকে বার আষ্টেক ঘুরিল। কিন্তু সুবিধা কোনদিকে নাই, তাঁবুর কোথাও একটু ছেঁড়া রাখে নাই। দরজার সামনে পরদা টাঙানো, তার ফাঁক দিয়া একটু-আধটু নজর চলে বটে, কিন্তু সেখানে জনকয়েক এমন মারমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ভিতরে চাহিতে সাহস কুলায় না।

ওদিকে এক সারি দোকানে বড় বাহার করিয়া গ্যাসের আলো জ্বালিয়া দিয়াছে, ঠিক যেন দিনমান। ছেলে-ছোকরার ভিড় সেখানটায় কিছু বেশি। একটা দোকানের সামনে গিয়া নিতু অবাক হইয়া গেল, তাহার বয়সী আরও তিন-চারিটি ছেলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। অত্যাশ্চার্য ব্যাপার, একটা ইঞ্জিন আর তার সঙ্গে খান তিন-চার রেল-গাড়ি—পূজার সময় মামার-বাড়ীতে যে গাড়িটা চড়িয়া গিয়াছিল, অবিকল তাই—তবে অতিশয় ছোট ; আবার লাইনও পাতা রহিয়াছে। দোকানি

দম দিয়া ছাড়িয়া দেয়, গাড়ি লাইনের উপর গড়-গড় করিয়া একবার আগাইয়া যায়, আবার পিছাইয়া আসে…

মজা আরও আছে অনেক। এদিকে নাগরদোলা ঘুরিতেছে, পাশের একটা দোকান হইতে রকমারি বাঁশীর সুর ভাসিতেছে, মাঠে বাজি পোড়ানো হইতেছে, শোঁ-শোঁ করিয়া হাউই আকাশে উঠিয়া তারা কাটিতেছে…অন্য ছেলে কয়টি ছুটিয়া বাজি দেখিতে গেল। নিতাই আগাইয়া গিয়া ইঞ্জিনের গায়ে সন্তর্পণে একটু আঙুল বুলাইয়া দেখিল।

—নেবে খোকা? পয়সা আছে কাছে?

হুঁ—বলিয়া আসিবার সময় রাঙাদিদির কাছ হইতে কয়টা পয়সা আনিয়াছিল, তাহাই সে বাহির করিয়া দেখাইল।

দোকানি কহিল—ওতে হবে না ত' টাকা লাগবে। কার সঙ্গে এসেছ? যাও বাবাকে নিয়ে এস, দশটা অবধি আমার দোকান খোলা আছে। যাও—

নিতুর অদৃষ্ট ভাল, ছোট দাদু অবধি যাইতে হইল না, সামনেই পড়িয়া গেলেন ক্ষেত্রনাথ। রোজ বিকালেই ক্ষেত্রনাথকে মেলায় আসিতে হয়। সঙ্কীর্তনের আকর্ষণে নয়—মেলার মধ্যে চারিদিককার গ্রাম হইতে বিস্তর খেজুর গুড় আমদানি হয়, প্রতিবছর এই সময়টায় তিনি কিছু গুড় কিনিয়া রাখিয়া বর্ষাকালে দক্ষিণের ব্যাপারিরা আসিয়া পড়িলে ছাড়িয়া দেন। এইপ্রকারে দু-পয়সা লভ্য হইয়া থাকে।

নিতাই ক্ষেত্রনাথকে জড়াইয়া ধরিল। ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—এসেছ আজ আবার? কি বলবে বলে ফেল—দেরি কেন দাদা? ক্ষিধে? বাড়ি থেকে পা বাড়ালে ক্ষিধে অমনি সঙ্গে সঙ্গে পিছু নেয়—

নিতাই হাসিয়া আবদারের সুরে কহিল—কর্তাদাদু ইদিকে একবার এসো—শিগগির এসে দেখে যাও—

—গাঁট খালি—এই দেখ আজ কিছু হবে না।

কিন্তু উল্টাগাঁট উঁচু হইয়া রহিয়াছে, নিতুর সেদিকে নজর আছে। বলিল—না কর্তাদাদু, আমার ক্ষিধে পায় নি—সত্যি পায় নি—বিশ্বের কিরে। তুমি একটিবার এসে দেখে যাও।

গাড়ি ও ইঞ্জিনের দাম দোকানি হাঁকিল পাঁচ সিকা।

অগ্নিমূর্তি হইয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—দিনে ডাকাতি করতে এসেছে এখানে? ঐ ত টিনের পাত, জিল-জিল করছে, তিনটে দিনও টিকবে না। আয় খোকা, চলে আয়—কি হবে ও নিয়ে। আমরা নেবো না—

দোকানি নিরুত্তরে স্প্রিঙে দম দিতেছিল। ছাড়িয়া দিতে ইঞ্জিন লাইনের উপর ছুটিতে শুরু করিল।

—চলে আয়। বলিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুর হাত ধরিয়া টানিলেন। কিন্তু সে নড়ে না। আর একবার টান দিতে দোকানের খুঁটি জাপ্টাইয়া চিৎকার শব্দে নিতাই কান্না জুড়িয়া দিল।

—সব তাতে তোমার ইয়ে—না? পাজি কাঁহাকা!

ক্ষেত্রনাথ যত টানেন, তত জোরে নিতু খুঁটি আঁটিয়া ধরে। তারপর খুঁটি ছাড়িয়া গেল ত ঝাঁপ ধরিতে চায়। নাগাল না পাইয়া সেইখানে সে মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িল।

হঠাৎ শঙ্কিত ব্যস্ত স্ত্রীকণ্ঠ।

—ছুঁসনি, ছুঁসনি—অ হতচ্ছাড়া ছেলে, দিলে বুঝি এই রাত্তিরে ছুঁয়ে?

মেয়েলোকটি ঠিক মেলায় আসে নাই, রাস্তার ধারে ছইওয়ালা

একখানা গরুর গাড়িতে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গণ্ডগোল ও ছোটছেলের কান্না শুনিয়া কয়েক পা আগাইয়া উঁকি দিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। একদিকে স্তূপাকার বাঁশের চাঁচাড়ি পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া মেলার যাবতীয় বাঁশের কাজকর্ম হইয়াছে—স্পর্শদোষ বাঁচাইতে তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া তাহার উপর উঠিল। লোক জমিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ নিতুকে ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন।

জনমত ক্ষেত্রনাথের প্রতিকূলে। যার যেমন খুশি মন্তব্য করিতে লাগিল।

—আচ্ছা গোঁয়ার-গোবিন্দ হে! মেরেই ফেলেছিল ছেলেটাকে··· শাসন করতে হয় বলে এমনি শাসন?···রক্ত পড়ছে যে—লোকটা কে হে?···ধরে জেলে দেওয়া উচিত!

নিতুর হাতে-পায়ে আচড় লাগিয়া দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়িতেছিল, তাহা ঠিক।

ক্ষেত্রনাথকে যাহারা চিনিত, তাহারা অত দরদ দিয়া সম্বর্ধনা করিতে পারিল না। বলিল—যা হবার হয়েছে চাটুয্যে মশায়, রাগ না চণ্ডাল—আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, তুলে নিন নাতিকে, বাড়ি গিয়ে কাটা জায়গায় তেল-টেল দিন গে। হাঁটিয়ে নেবেন না যেন—গাড়ি করে চলে যান।

স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে নির্বিঘ্ন স্তূপ হইতে নামিয়া নিতুকে কোলে তুলিয়া শান্ত করিতে বসিয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়া বিধবা; দেহ ক্ষীণ বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের জোর যেমন অসামান্য, তেমনি উহা যেন মধু ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া যায়। ক্ষেত্রনাথের দিকে এক পলক তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিধবা কহিল—পয়সাকড়ি চিতেয় সঙ্গে নিয়ে উঠবে নাকি?

অতিশয় সঙিন প্রশ্ন। উচিতমতো উত্তর দিতে গেলে আবার একদফা দুর্যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশ গ্রামের লোকের সম্মুখে ক্ষেত্রনাথের আর তাহাতে উৎসাহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য এই, যাহাকে লইয়া এত লোকের এমন দুশ্চিন্তা, চক্ষের পলকে সেই নিতাইচন্দ্র লাফ দিয়া উঠিয়া পুনশ্চ দোকানের খুঁটি, আঁটিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল।

বিধবা বলিল—দাও না গো দোকানি, ছেলেমানুষ ধরে বসেছে—দিয়ে দাও সস্তা করে।

দোকানি বলিতে লাগিল—এক টাকার কম দেওয়া যায় না মা, কল বলেই না এত দাম। এই গাড়িটে নিন, চার পয়সায় দিচ্ছি। চাকা আছে, চোঙ আছে, কিন্তু টানতে হবে দড়ি বেঁধে।

—আমরা দড়ি বেঁধেই টানব, কি বল খোকা? বলিয়া চার পয়সার গাড়িটা তুলিয়া সে নিতুর হাতে দিল।

ক্ষেত্রনাথ চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু রঙ্গস্থলে হৃদয় রায় আসিয়া পড়িতেই পরিচয় প্রকাশ পাইল। হৃদয়ের হাতে একবোঝা হাটের বেসাতি। বলিল—আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে। এইবার গাড়িতে চলুন দিদি—

অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে জগদ্ধাত্রী বাপের বাড়ির গ্রামে ফিরিতেছে, হৃদয় মুরুব্বি হইয়া লইয়া যাইতেছে। দূর জ্ঞাতিসম্পর্কের এই দিদিটির প্রতি ভক্তি তাহার যেরূপ, গুরুজনদিগের প্রতি সেই প্রকার ভক্তি এই কলিযুগের দিনে লোকে যেন শিক্ষা করিয়া রাখে।

জগদ্ধাত্রী ডাকিল—গাড়িতে এস খোকা।

এবং নিতুকে কোলে তুলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

নিঃশব্দ গ্রামপথ। কচিৎ কখন মেলার ফিরতি দু-একটি

লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বালুপথে গরুর গাড়ির শব্দ হইতেছে না। গাড়ির পিছনে ক্ষেত্রনাথ ও হৃদয় পাশাপাশি চলিয়াছেন।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন—তাই ত বলি, ব্যাপার কি? ভটচায-বাড়ি এত বড় খাওয়া-দাওয়া, তার মধ্যে আমাদের হৃদয় নেই। তোমার সেজছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলল—বাবার পেটের অসুখ, নেমন্তন্নে আসবে না। নিজে না গিয়ে গাড়ি পাঠালেই ত জগদ্ধাত্রী আসতে পারত।

হৃদয় অপ্রস্তুতের ভাবে নানা প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল—সে জন্য নয়, এমনি গিয়েছিলাম ওদিক। দিদি বললেন, এত বড় মেলা হচ্ছে, দেশবিদেশ থেকে মানুষজন আসছে, দেখে আসিগে একবার।...গাড়ি তাড়া-টাড়া ওঁরই সব—আমার কি গরজ পড়েছে বলুন—

ওদিকে দুইয়ের মধ্যেও মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইয়াছে।

নিতুর মতে এ জগতের একটি লোকও ভাল নয়।

—কর্তাদাদু?

—মারে।

—মেজ কাকা, ছোট কাকা?

—তারাও।

বাবা এবং কাকাবাবুরা বাড়ি আসিবার সময় তার জন্য নানারকম জিনিষ লইয়া আসে, সে হিসাবে ভালই। কিন্তু অপরাধ তাদের, আবার চাকরি করিতে চলিয়া যায়। বাড়ি থাকিতে বলিলে কথা শোনে না—মিছা কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া চলিয়া যায়।

—আর আমি? জগদ্ধাত্রী সমস্যাময় প্রশ্ন করিয়া বলিল—আমি কেমন লোক, বল ত নিতুবাবু।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—এই গাড়ি কিনে দিলাম তোমায়, আমি ভাল না ?

নিতাই কহিল—তোমার গাড়ি মোটে চলে না, কলের গাড়ি ভাল।

—আচ্ছা কিনে দেব ঐ কলের গাড়ি। হাসিমুখে জগদ্ধাত্রী বলিল—কিনে দেব, যদি এক কাজ করতে পার—

উৎসাহের প্রাবল্যে নিতাই খাড়া হইয়া বসিল।

—দাও।

—বললাম ত, একটা কাজ করতে হবে।

—কি বল, এক্ষুণি করব। নিতাই গরুর গাড়ি হইতে লাফাইয়া তখনই কাজে প্রবৃত্ত হইতে যায় আর কি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—আমায় যদি বিয়ে কর নিতুবাবু। করবে ?

সঙ্কীর্ণ গ্রামপথ, পথের ধারে ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল···আকাশে শীতের নির্জীব অস্পষ্ট চাঁদ···নিকটে-দূরে এখানে ওখানে ক'খানা ঘুমন্ত খোড়ো ঘর···হঠাৎ তাহার মধ্যে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল—যেন এক বৈঠার আঘাতে একটি ডিঙা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর উজান ঠেলিয়া গেল। গাড়ির পিছনে চলিতে চলিতে ক্ষেত্রনাথ সেই কথা কয়টি শুনিতে লাগিলেন—আমায় বিয়ে করবে, আমায় বিয়ে করবে গো ?

বছর চল্লিশ পরে লোকনাথ ঠাকুরের মেলায় জনারণ্যের মাঝখানে ক্ষেত্রনাথ কয়েক মুহূর্তের জন্য আজ জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন বটে—তাহাও বড় ঝাপসা রকম, বয়সকালের চোখের সে দৃষ্টি নাই—রাত্রিবেলা কোন কিছু ভাল করিয়া দেখিতে পান না, সেই ক্ষণিকের দেখা মূর্তি ভুলিয়া গিয়াছেন···কোন কালের কোন মূর্তিই মনে নাই। কেবল মনে আসিতেছে, কারণে-অকারণে খিল-খিল করিয়া হাসি, আবার সঙ্গে সঙ্গেই জলভরা অভিমানাহত ডাগর ডাগর চোখ দু'টি···

—আমায় বিয়ে করবে ? ও দাদা, বিয়ে করবে আমায় ?

ক্ষেত্রনাথের বৌদি সম্পর্কের এক নিঃসন্তান বিধবা তাহাদের বাড়িতে থাকিতেন। এতটুকু মেয়ে জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে আসিলে বৌদিদি আদর করিয়া চুল বাঁধিয়া খয়েরের-টীপ পরাইয়া গিন্নির ঝাঁপি হইতে আলতা-পাতায় পা ছোপাইয়া অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া তাহাকে ক্ষেত্রনাথের কাছে পাঠাইতেন। ক্ষেত্রনাথের বয়স বেশি, বুদ্ধিও বেশি। নায়িকার শুভ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে স্বামিত্বের প্রথম সোপানস্বরূপ তার পিঠের উপর যে বস্তু উপহার দিত তাহাতে জগদ্ধাত্রী ব্যথায় যত না হউক অভিমানে চতুর্গুণ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত···সেই সব কথা মনে পড়িতে লাগিল।

সেদিন উমানাথ বাড়ি ফিরিল, যখন চাঁদ ডুবিয়াছে। অত রাত্রেও ক্ষেত্রনাথের ঘরে আলো। উমানাথ খিড়কি ঘুরিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার মতলবে টিপিটিপি কয়েক পা পিছাইয়াছে, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের চোখকে হয়ত ফাঁকি দেওয়া যায়, কান ভারি সজাগ। বলিলেন—কে ? কে ও ? এই ঘরে এসো। তোমার জন্যে বসে আছি কেবল—

হয়ত সত্যই তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত যে হাত-পা কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনটা দলিলের বাক্সই খুলিয়া ডালা তুলিয়া রাখা, প্রদীপে এক সঙ্গে অনেকগুলা সলিতা ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চোখে চশমা-আঁটা, স্তূপীকৃত দলিলের মধ্য হইতে একখানা বাছিয়া ক্ষেত্রনাথ মেজের উপর উবু হইয়া যেন ঐ দলিলখানির উপর স্তিমিত চোখের সকল দৃষ্টিশক্তি ঢালিয়া দিয়া পড়িতেছিলেন।

উমানাথ কহিল—এখনো শোন নি আপনি ?

এটা কিছু নূতন ব্যাপার নয়, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই ইহাতে।

বৈষয়িক ব্যাপারে ক্ষেত্রনাথের সতর্কতা চিরদিনই অপরিসীম, এ বিষয়ে দিনরাত্রি জ্ঞান নাই। দলিলের বাক্সগুলি থাকে শোবার ঘরে ঠিক শিয়রের কাছ-বরাবর, প্রত্যেকটি দলিলের গায়ে একটুকরা করিয়া কাগজ আঁটা, তাহাতে ক্ষেত্রনাথের স্বহস্তে লেখা স্থূলমর্ম। শীতকালে এক-একদিন কাগজপত্র ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রৌদ্রে দেন, সমস্ত বেলা নিজে পাহারা দিয়া পাশে বসিয়া থাকেন, আবার নিজের হাতে সমস্ত গোছাইয়া নূতন কাপড়ের দপ্তরে সাজাইয়া বাঁধিয়া রাখেন। এমন অনেক দিন হইয়া থাকে, নিষুপ্ত গভীর রাত্রি—এক ঘুমের পর ক্ষেত্রনাথের মনে কি রকম একটা গোলমাল লাগিল, উঠিয়া আলো জ্বালিয়া বাক্স খুলিলেন, তারপর দু-চারিটা দলিল বাহির করিয়া নিবিষ্ট মনে খানিক পড়িয়া দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে পারেন। গৃহিণী গত হইবার পর হইতে ইদানীং রোগটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

উমানাথ কহিল—রাত একটা-দুটো বেজে গেছে। আর রাত জাগবেন না দাদা।

ক্ষেত্রনাথ বাহিরের পানে চাহিলেন। কিন্তু জানলা বন্ধ, কি দেখিবেন? বলিলেন—রোসো। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র তুলিয়া রাখিলেন, বলিলেন—এসো এদিকে, সিন্দুকটা ধরো দিকি—

—কোন্ সিন্দুক?

বিরক্ত মুখে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—সিন্দুক ক'টা আছে তোমাদের বাড়ি? বাক্সর কথা বলছি নে, ঐ—ঐ সিন্দুক—

অনেক পুরানো সেগুন কাঠের অতিকায় সিন্দুক, কাঠগুলি কাল পাথরের মতো হইয়া গিয়াছে। এমন জিনিষ আজকালকার দিনে হয় না। আগে উহার সমস্ত গায়ে ফুল-তোলা অপ্সরী-আঁকানো বিস্তর সাজপত্র ছিল, দু-একটা করিয়া খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এখন তার চিহ্নমাত্র

নাই। ইদানীং ইহা বড় একটা ব্যবহারেও আসে না। এখানে সেখানে তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া ঘরের এক কোণে অবহেলিত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

খানিক টানাটানি করিয়া উমানাথ কহিলেন—চার-পাঁচ মনের ধাক্কা দাদা, নড়ে চড়ে না একটু—

—ভাল করে ধরো। বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক ধরিয়া প্রাণপণ বলে ঝুলিয়া পড়িলেন। কিছুতে কিছু হয় না। পরিশ্রমের ফলের হাঁপাইতে লাগিলেন, বলিলেন—দেবীদাস রায়ের সিন্দুক এর নাম—নড়বে কি সহজে? মধ্যে আবার তোমার ঐ সহায়রাম আর সার্বভৌম ঠাকুরের গুষ্টির পিণ্ডি বোঝাই করা। এই রাত্রে খুলে যে সব বের করে ফেলা, সে-ও ত মহা হাঙ্গামের ব্যাপার—

চিন্তান্বিত মুখে ক্ষেত্রনাথ চুপ করিলেন। উমানাথ বলিল—এখন কি ওসব হয়? দরকার হলে সকালবেলা না হয় মানুষ-জন ডেকে সরিয়ে ফেলা যাবে—

বুদ্ধির জাহাজ! ক্ষেত্রনাথ চটিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—খুব কথা বললে তুমি! সকালবেলা লোক জানাজানি হয়ে যাবে না? যা করবার এখুনি করতে হবে।

সহসা যেন সমাধান দেখিতে পাইয়া বলিলেন—এক কাজ কর দিকি, চালির থেকে বালিশ-বিছানা সব পাড়ো। ঐগুলো সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রেখে দাও, বাইরে থেকে যাতে দেখা না যায়। মনে হবে, এখানে কেবল বিছানাপত্তোর গাদা করা রয়েছে।

সিন্দুক ঢাকা হইয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ আলো ধরিয়া এদিক-ওদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া খুশি হইলেন। বলিলেন—জগদ্ধাত্রী ত জগদ্ধাত্রী, শ্মশান থেকে সহায়রাম রায় উঠে এলেও আর ধরতে হচ্ছে না।

সিন্দুকের ইতিহাস উমানাথ সমস্ত জানে এবং আজ জগদ্ধাত্রী যে গ্রামে আসিয়াছে সে কথাও তাহার কানে গিয়াছে। অতএব এখনকার আয়োজন দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বলিল—এই ত ভাঙাচোরা খানকতক তক্তা--কি-ই বা জিনিষ—এ দেখে তারপরে কি আর জগদ্ধাত্রী দিদি দাবি করতে আসবেন? আর করেনই যদি, অনাথা বিধবার জিনিষ—দিয়ে দেওয়া উচিত।

রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—কোনটা কার জিনিষ—সে আমাদের সেকেলে সত্বাসত্বির কথা। তুমি তার কি খবর রাখ যে বলতে এসেছ?

তাড়া খাইয়া উমানাথ নিরুত্তর হইল। ক্ষেত্রনাথ তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, উমানাথ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগে আছে। কিঞ্চিৎ হাসিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন—ভায়া আমার মনে মনে ভাবেন, দাদা দেশের লোককে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয় করেছে। জগদ্ধাত্রী আমায় এক চিঠি দিয়েছিল—দেখেছ?

—হ্যাঁ।

আশ্চর্য হইয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—কোন চিঠি দেখেছ? কি লেখা আছে বল ত?

—দেশে ফিরে অবধি দিদি ত ঢের চিঠি লিখেছেন। সেই যে সহায়রাম কাকার ভিটেবাড়ির দরুন টাকা চেয়ে লিখেছিলেন—

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—ও ত হৃদয় রায়ের চিঠি—হৃদয় শিখিয়ে দিয়েছে, জগদ্ধাত্রীর হাতের লেখাটা কেবল। আগের চিঠি দেখেছ?

—তাতেও ঐ। লিখেছেন, বসতবাড়ির দরুন না দাও—ঘর সারাতে হবে, তারই সাহায্য বলে দাও গোটা পাঁচেক টাকা।

ক্ষেত্রনাথ অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—সে আগের কথা

বলছি নে। তুমি সে সময় বিষ্ণুপুরে বেহালা বাজিয়ে বেড়াও। সহায়রাম রায় মারা গেলেন। জগদ্ধাত্রী সেই সময় দিল্লি থেকে চিঠি লিখেছিল। চিঠি নয় সে আমার দলিল। দেখেছ?

উমানাথ তাহা জানে না। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—গোড়া না জেনে বলতে নেই। বিয়ের পর-বছর জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে গেল পশ্চিমে। সহায়রাম খুড়ো মারা গেলে খবর দিলাম, কেউ এল না। জগো লিখল বাবার জিনিষপত্তর যা আছে—তুমি নিও; তুমি নিলেই বাবার তৃপ্তি হবে। ঐ হৃদয়ের বাপ বরদাকান্ত রায় মশায় তখন বেঁচে। তিনি এসে বাদী হলেন, বলেন—আমরা হলাম নিকট জ্ঞাতি; সহায়রামের অস্থাবর আমাদের ডিঙিয়ে ক্ষেত্তোর চাটুজ্জে পর্যন্ত পৌঁছয় কি করে? লোক ডাকাডাকি, হুলস্থূল কাণ্ড। জিনিষের মধ্যে ত খানকতক পিঁড়ি-বারকোষ আর ঐ দেবীদাস রায়ের সিন্দুক—ছাইভস্মে বোঝাই। আমারও জেদ—তাই বা ছাড়ব কেন?

ছাইভস্ম? এই অঞ্চলের একটা বিখ্যাত বস্তু এই সিন্দুক, যা লইয়া সহায়রাম রায় পালা বাঁধিয়াছিলেন। এখনও ক্ষেত নিড়াইবার মরসুমে চাষাভুষার মুখে উহার দশ-বিশটা কলি মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রনাথ সিন্দুক খুলিয়া দেখেন নাই, খুলিলে হয়ত দেখিতেন ছাইভস্ম নয়, তাল তাল সোনা ফলিয়া আছে। সহায়রামের গানের দু'টি ছত্র উমানাথের মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—

> সিন্দুকের মধ্যে সোনার বৃক্ষ, বৃক্ষে ফলে সোনা,—
> আকাশের চাঁদ দিব পেড়ে (ও বাপ) সিন্দুক খুলিব না।

নিজের ঘরে আসিয়া উমানাথ দেখিল, তরঙ্গিণী দুয়ার ভেজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। একটা জানলা খুলিয়া দিতেই টাটকা বুনো ফুলের গন্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের পালার কথাগুলি একটির পর একটি

যেন বাহিরের ঘন অন্ধকারের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কত রাত্রি অবধি সে আপনার মনে গুণ-গুণ করিতে করিতে অবশেষে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। ঢাকা দেওয়া খাবার পড়িয়া রহিল, খাওয়া হইল না।

দেবীদাস রায় সম্পর্কে জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরদাদা—সহায়রাম রায়ের কি রকমের খুড়া হইত। বাপ ছিলেন দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ, দু-দশঘর যজমানের কল্যাণে কায়ক্লেশে সংসার চলিত। কিন্তু দেবীদাস ওপথেই গেল না, দিনরাত কেবল কুস্তি লড়িয়া লাঠি ভাঁজিয়া ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে বেড়াইত। মজা টের পাইল—বাপের জীবনঅন্তে। বয়স তাহার তখন কুড়ি-বাইশ। নিত্যকর্ম-পদ্ধতি খুলিয়া অবাধ্য স্মরণশক্তিকে বশে আনিবার রীতিমত প্রয়োজন পড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে এক যজমান-বাড়ি কি একটা ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইয়া আসিয়া মনের ঘৃণায় দেবীদাস নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। লোকে বলিত—নবদ্বীপের কোন টোলে পড়িতে গিয়াছে। পড়াশুনা কতদূর কি হইয়াছিল জানা নাই, মাস ছয়েকের মধ্যেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল, দেবীদাস ফিরিয়া আসিতেছে—সঙ্গে দু'খানা গরুর গাড়ি। একটা হইতে নামিল, বেশ গোলগাল গড়ন হাসিমুখ একটি বধূ, অন্যটি হইতে নামাইল ঐ বিশালকায় সিন্দুক।

মেয়েরা আড়ি পাতিতে গিয়া দেখিয়াছে, নববধূ গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রদীপের সামনে তালপাতার পুঁথি লইয়া নিবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিত, আর দেবীদাস খাটের অপর প্রান্তে অনেকটা দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইত কি, কি করিত কে জানে? মোটের উপর বোঝা যাইত, সরস্বতী-সম্পর্কিত ব্যাপারগুলাকে তখনও দেবীদাস সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলে।

তারপর কেমন করিয়া বলিতে পারি না, বধূর সঙ্গে ভাব জমিয়া আসিল। এক একদিন রাত্রে টিপিটিপি ঘরে ঢুকিয়া দেবীদাস অধ্যয়ন-রত বধূর যৌবনস্নিগ্ধ তদ্গত মুখের দিকে প্রলুব্ধ চোখে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিত। তবু সম্বিৎ হয় না দেখিয়া একটানে বালিশ বিছানা বধূ ও পুঁথিসুদ্ধ খাটখানি জানালার দিকে হুড়মুড় করিয়া টানিয়া লইত, বধূ চমকিয়া সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া। তখনই সে ভাব সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিত —অমনি করতে হয়? এলে সাড়া দাও নি কেন?

দেবীদাস হাসিমুখে চাহিয়া থাকে।

বধূ বলিত—খাট সমেত টেনে নিলে, তোমার গায়ে জোর ত খুব—

দেবীদাস সগর্বে পেশীবহুল সুস্পষ্ট হাত দু'খানি নাড়িয়া বলিত—ভারি ত! এতে আর জোরটা কি লাগে? আচ্ছা ঐ সিন্দুকটাও চাপিয়ে দেও খাটের উপর। তারপর যেমন বসেছিলে তেমনি থাকো। দেখ—

আবার হাসিয়া বলিত—এ বসে বসে কেবল তালপাতা নাড়া নয়।

বিস্ময়ে বধূর চোখ কপালে উঠিত।—সত্যি পার?

দেখ—বলিয়া দেবীদাস বধূকে ছোট্ট একটি তুলার পুঁটুলির মতো শূন্যে তুলিয়া ধরিত। তারপর লুফিয়া টানিয়া বুকের মধ্যে আনিতে গেলে বধূ কাঁপিয়া চেঁচাইয়া উঠে।

তখন মাটিতে নামাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীদাস বলে—ভয় পেয়েছ বড্ড? তারপর সদয় কণ্ঠে বলে—আর ভয় দেব না।

একদিন দুপুর রাত্রে দু'জনে ঘুমাইয়া আছে। খুট-খুট শব্দ হইতেছে। বধূ জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে স্বামীর বুকের মধ্যে লুকাইল। ফিস-ফিস করিয়া কহিল—শুনছ?

দেবীদাসেরও ঘুম ভাঙিয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। বলিল —চোরে সিঁধ কাটছে বোধ হয়। কিছু ভয় নেই, তুমি আমায় ছাড় ত একটু লক্ষ্মী—

অনেক করিয়া বধূকে সে ঠাণ্ডা করিল।

খন-খন ভস-ভস—মাটি ঝরিয়া পড়িতেছে। ছোট সরু জানলা, তাহারই নিচে সিঁধ কাটিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ জানলার পাশে বসিয়া আছে। ক্রমে গর্ত কাটা হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর একটা কাল মাথা সিঁধের মুখের ভিতরে আসিতেছে।

বধূ ব্যস্ত হইয়া আঙুল দিয়া দেখাইল—ঐ—

চুপ—বলিয়া দেবীদাস তাহাকে থামাইয়া দিল। বলিল—মানুষ নয়, ও লাঠির মাথায় কাল হাঁড়ি। আগে ঐ পাঠিয়ে পরখ করে, কেউ পাহারা দিয়ে বসে আছে কি-না। চুপ, চুপ—

হাঁড়ি ঘরের মধ্যে অনেকখানি আসিয়া এদিকে-ওদিকে নড়িয়া চড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

আবার চুপচাপ। তারপর দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে গর্তের আলগা মাটির উপর দিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে সত্যকার মাথা। অন্ধকারে দেবীদাসের মুখে তীক্ষ্ণ হাসি খেলিয়া গেল। চোর আর একটু আসিতেই তাহাকে ঝাপটাইয়া ধরিয়া হো-হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

নিতান্ত ছেলেমানুষ চোর, একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল— আমি কিচ্ছু জানিনে ঠাকুর মশাই, আমায় ওরা ঠেলে পাঠিয়েছে—আমি নতুন লোক—

—ওরা কারা ?

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, জন দুই-তিন দাওয়া হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িল।

দেবীদাস হাসিয়া বলিল—যা হতভাগা বেকুব বেল্লিক—আর কাঁদিস নে, যা চলে—

বলিয়া দোর খুলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া পলায়মান একটি আবছা মূর্তি লক্ষ্য করিয়া দেবীদাস ছুটিল।

বাড়ির সীমা ছাড়াইয়া বিল; লোকটি ছুটিতে ছুটিতে বিলে গিয়া পড়িল। শুকনার সময় বিলে জল-কাদার সম্পর্ক নাই। দেবীদাস তীরের মতো ছুটিয়াছে। কাছাকাছি আসিয়া বলিল—আর পালাবি কতদূর? বিলে এসেই যে ভুল করলি, বেকুব গাধা কোথাকার! এখানে গা-ঢাকা দিবি কোথায়?

কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবার আগেই চোর একটা উঁচু আ'ল বাধিয়া পড়িয়া গেল। দেবীদাস কাছে আসিয়া পড়িল, কিন্তু গায়ে হাত দিল না। বলিল—এখন ধরব না। ওঠ বেটা, ছোট্—শেষে তুই ভাববি, পড়ে না গেলে দেবীদাস রায় ধরতে পারত না—

লোকটি কিন্তু উঠিল না, পড়িয়া পড়িয়াই কাতরাইতে লাগিল। পড়িয়া গিয়া তাহার পা ভাঙিয়াছে। অতএব দৌড়িয়া ধরিবার বাসনা স্থগিত রাখিয়া দেবীদাস আপাতত চোরকে কাঁধে করিয়া আসিল। দিন তিনেক ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিস্তর তদ্বির করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিল।

একদিন বধূ সেই চোরকে জিজ্ঞাসা করিল—কি মতলবে এসেছিলি বাবা? জানিস ত আমরা ভিখিরি বামুন—

অনেক রকমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল, এদেশে গুজব রটিয়াছে—দেবীদাস রায় বিবাহ করিয়া সিন্দুক ভরিয়া বিস্তর টাকা আনিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকে তাই নিশিরাতে এই বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে—

বধূ বলল—টাকা নয় রে বাবা, সোনার তাল। সিন্দুকে সোনার গাছ আছে—তাল তাল সোনার ফলন হয়…সে আমি দেখাব না ত—কিছুতেই না।

তারপর হাসিতে হাসিতে সিন্দুকের ডালা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল। অগণিত তালপাতার পুঁথি। তাহারই কয়েক বোঝা তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সিন্দুকের ভিতর দেখাইল। অজস্র পুঁথি, তা ছাড়া আর কিছু নাই।

বধূ বলিল—আমার বাবা মস্ত বড় সার্বভৌম পণ্ডিত, মরবার সময় সিন্দুক-বোঝাই এই সব ধনরত্ন দিয়ে গেছেন—এর এক টুকরা আমি কাউকে দিতে পারব না বাপু—

এক বছরের আগ-পাছ স্বামী-স্ত্রী অপুত্রক মরিল। দেবীদাসের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি সহায়রামে বর্তাইল। সহায়রামের পৈতৃক তেজারতির কারবার ছিল; কিন্তু এক দুরারোগ্য রোগে সমস্ত মাটি করিয়া দিল। সহায়রাম পালা লিখিতেন—যাত্রার পালা, কীর্তন-কথকতার পালা—দুই কানে যাহা শুনিতেন, পালায় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন। বন্ধকি কাগজ-পত্র অন্দরে গিন্নির বাক্সে তালাবন্দি হইয়া থাকিত, দেবীদাস রায়ের সিন্দুকটি কেবল সহায়রামের নিজস্ব সম্পত্তি—ওটি থাকিত বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে। ভোরবেলা সকলের আগে উঠিয়া আসিয়া সিন্দুকের উপর বসিয়া বসিয়া তিনি সুর ভাঁজিতেন। খাগের কলম ও হলদে কাগজের খাতা বাহির হইত। লোকজন আসিতে শুরু হইলে খাতাকলম আবার সিন্দুকে ঢুকিত।

প্রৌঢ় বয়সে সহায়রামকে বড় শোকতাপ পাইতে হয়। তিনটি ছেলে ওলাউঠায় মরিয়া গিয়া একেবারে নির্বংশ হইলেন। আগে যা একটু কাজকর্ম দেখিতেন, ইহার পরে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—

বড় একটা বাড়ির মধ্যেই আসিতেন না, সমস্ত দিন ও অনেক রাত্রি অবধি সিন্দুকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। এক এক সময়ে গানের খাতা খুলিয়া সুর ধরিতেন। সুর খুলিত না, গলা আটকাইয়া যাইত, চোখের জল খাতার উপর টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িত।

এই সময়ে জগদ্ধাত্রীর জন্ম হয়।

মেয়ের যতদিন বিবাহ হয় নাই, মেয়ে ছাড়া কিছুরই তিনি খোঁজ রাখিতেন না। গিন্নি মারা গেলেন, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, সহায়রামের যাহা-কিছু ছিল মেয়ের বিবাহে উজাড় করিয়া দিয়া দিলেন —দিলেন না কেবল ঐ সিন্দুক। নিরালা খোড়ো ঘরে কর্মহীন বৃদ্ধের জীবনান্তকাল পর্যন্ত ঐ সিন্দুক ও গানের খাতা সম্বল হইয়া রহিল। উমানাথ সেই সময়ে রাতদিন বুড়ার সঙ্গে লাগিয়া থাকিত। তার অনেক দিন পরে সহায়রামের মৃত্যুর পর তাঁহাকেই গুরু বলিয়া ভণিতা দিয়া উমানাথ কবির দলে গান বাঁধিতে শুরু করিয়াছে।

পরদিন বেলা বোধ করি প্রহরখানেক হইবে, জগদ্ধাত্রী সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। পরণে তাহার অতি জীর্ণ একখানি মটকার থান; স্নান হইয়া গিয়াছে, ভিজা চুলের উপর ফেরতা দিয়া আঁচল জড়ানো।

—কই গো, মানুষ-জন কোথা?

প্রথমটা জবাব আসিল না। আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিতে তরঙ্গিণী বাহিরে আসিল। দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া মুখ কালো করিয়া প্রণাম করিতে গেল। জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া বলিল— ছুঁয়ে দিও না, দিদি। তোমাদের কর্তাদের সঙ্গে কাজ রয়েছে, কাজ সেরে এই পথে অমনি মঠবাড়ির মচ্ছবে যাব। তুমি ত উমানাথের বৌ—

বাড়ির গিন্নি হয়েছ এখন। দেখি—দেখি—সেদিনকার উমানাথ—তার আবার বৌ, সে হল গিন্নিঠাকরুণ—বলিয়া হাসিতে গিয়া তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না। বলিল—কি সুন্দর সোনার সংসার আগলে বসে আছিস বৌ, দেখে যে হিংসে হয়!

সেজবৌ ও ছোটবৌ ঘাটে গিয়াছিল। সমস্ত ঘাটের পথ বকবক করিতে করিতে এখন আসিয়া রান্নাঘরে কাঁখের কলসি নামাইল। অচেনা মানুষ দেখিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া গেল। জগদ্ধাত্রী ডাকিল—ইদিকে আয়, ঘোমটা দিচ্ছিস যে বড়! আমায় কুটুম্ব ঠাওরালি নাকি? মুখ তোল্—তোল্ শিগগির—

ঘোমটা টানিয়া শান্ত সভ্যভব্য হইয়া থাকা ছোটবৌর পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার। মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া আবার সে ঘাড় নামাইল।

জগদ্ধাত্রী বলিল—আমার যে ছোঁবার যো নেই, ওগো ও গিন্নি-ঠাকরুণ, এখানে এসে দে দিকি এই দুষ্টু মেয়ে দুটোর পিঠে দুটো কিল বসিয়ে—

তরঙ্গিণী আসিয়া উভয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিল। খুশি হইয়া জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিল—বাঃ বাঃ, চাঁদের মতো মেয়ে—লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'টি বোন।···হ্যালা, ও মেয়েরা, টিপিটিপি হাসছিস যে বড়! জানিস আমি কে?

বধূরা বোকা নয়। ছোটবৌ বলিল—আপনি পিসিমা—

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—জবাব শোন একবার। পিসিমা! গুণের নিধি শ্বশুরঠাকুর বলে দিয়েছেন বুঝি? কেন শুধু মা হলে দোষটা কি? হ্যাঁরে, মা বেঁচে আছেন ত?

জগদ্ধাত্রী বলিল—নেই? খেয়ে-দেয়ে অবসর হয়েছিস?

নানা কথায় বেলা বাড়িয়া আসিল। বহুকাল পূর্বে যখন এ-যুগের এই সব নূতন মানুষের দল পৃথিবীকে দখল করিয়া বসে নাই, তখন এই গ্রামের মধ্যে এই বাড়ির চতুঃসীমায় এই উঠানের ধূলার উপর অতীতের আর এক দল কিশোর-কিশোরী দিনের পর দিন যে-সব হাসি ও অশ্রু ছড়াইয়া বেড়াইত সেই ক্ষীণ বিস্মৃত কাণকাগুলি একজনে কুড়াইয়া ফিরিতেছে, আর দুইজন তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ বাহিরে অনেকগুলি গলার আওয়াজ শুনিয়া জগদ্ধাত্রী চুপ করিল।

ছোটবৌ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—গল্পে গল্পে ফাঁকি দিয়ে কত বেলা করে দিলাম, আপনি কিচ্ছু টের পান নি। এত বেলায় মচ্ছবে গিয়ে আর হবে কি ?

জগদ্ধাত্রী উত্তর করিল না! কান পাতিয়া ক্ষণকাল বাহিরের কথাবার্তা শুনিয়া একসময়ে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—হৃদয়ের গলা চিনিস তোরা ? ও কি হৃদয় কথা বলছে ? উঁহু—এখনও এলো না, আচ্ছা মানুষ !

মেজবৌ বলিল—আপনি বসে বসে গল্প করুন মা, আমি কাপড় ছেড়ে জল-টল এনে দিচ্ছি, তারপর রান্না চাপিয়ে দেবেন। বেশ ত হচ্ছিল, আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন—

মৃদু হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—গল্প করব বলে আসিনি মা, রান্না করব বলেও আসিনি—এসেছি কাজে। হৃদয়ই মুশকিল করল। ক্ষণপরে বলিল—বাড়িতে ট্যা-ভ্যা করছে না—তোদের বুঝি সে পাট হয় নি এখনও ?

ছোটবৌ ভালমানুষের মত মেজবৌকে দেখাইয়া কহিল—হয়েছে মেজদির একটা—সাত বছরের খোকা। মেজদি নিজেও এবার সতেরয় পড়েছে !

তাহার কানের পাশে কতকগুলি চুল উড়িতেছিল, খপ করিয়া তাই ধরিয়া আচ্ছা করিয়া টানিয়া মেজবৌ ছোটবৌকে শাস্তি দিল। সম্পর্কে ছোট জা, বয়সেও বোধ করি কিছু ছোট, শাস্তির কষ্টে সে হাসিয়া ফেলিল।

মেজবৌ বলিতে লাগিল—ছেলে একলা আমার নয় মা, উর-ও। বল তুই আভা, ছেলে তোর নয়। বল—

আভা তাহা বলিতে পারিল না। বলিল—ছেলে আমাদের তিন শাশুড়ি-বৌর। বলিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিণীর উদ্দেশে হাত তুলিয়া দেখাইল। বলিতে লাগিল—বড়-জা মারা যাবার পর থেকে নিতু থাকত মামার বাড়ি। গেল বছর এখানে এসেছে। সেই থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মেজদি ওকে যা করে তুলেছে—

মেজবৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—আব তুই বড্ড ভাল, না? মিথ্যে কথা বলিসনে আভা, তা-হলে তোর সমস্ত কীর্তি বলে দেব এক্ষুণি। জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর এক প্রশ্ন করিল—আপনার ছেলে-মেয়ে নেই?

স্মিত মুখে জগদ্ধাত্রী কহিল—কে বললে নেই? এই ত কতগুলি রয়েছিস তোরা।

উঠানের প্রান্তে ডালপালায় আচ্ছন্ন ছোট একটি পেয়ারা গাছ। সহসা নজরে পড়িল, গাছের নিচের দিককার ডালপালাগুলি ভয়ানক আন্দোলিত হইতেছে। সর্বাগ্রে নজর পড়িল মেজবৌর!

—কে রে? দু-একটা কুশি পড়েছে, হতভাগাদের জ্বালায় থাকবার জো নেই। কে রে তুই, কথা বলিস নে?

ছোটবৌ আগাইয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিল—আবার কে? সেই ডাকাত। ইস্কুল-টিস্কুল এর মধ্যে হয়ে গেছে তোমার? কখন এসে সুড়-সুড় করে গাছে চড়ে বসেছ···নেমে এস এক্ষুণি—

ডাকাত বিনাবাক্যে নামিয়া আসিল। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ছোটকাকীকে সে যৎকিঞ্চিৎ সমীহ করিয়া থাকে!

ছোটবৌ বলিতে লাগিল—সেদিন মানা করে দিইছি, তবু ডালে ডালে হনুমানের মত লাফাতে লেগেছে—হাত-পা ভেঙে পড়ে মরবে যে কোন দিন—

উচ্চকণ্ঠে পাড়া জানাইয়া বিশেষত একজন বাহিরের লোকের সামনে এই প্রকার তুলনামূলক আলোচনায় নিতাই অপমান জ্ঞান করিল। ঘাড় ফিরাইয়া হাত তুলিয়া বলিল—মারব।

ছোটবৌ হাসিয়া বলিল—ইস্—কত বড় মুরোদ! আয় দিকি কাছে এগিয়ে, কে কাকে মারে—আয়—

নিতাই আর আগাইল না, তা বলিয়া পরাজয় স্বীকারও করিল না। স্বস্থানে দাঁড়াইয়া বীরোচিত ভঙ্গিতে পুনশ্চ কহিল—মারব।

জগদ্ধাত্রী উঠানে নামিয়া আসিল। কহিল—গুরুজনকে মারতে চাচ্ছ, এই তোমার বুদ্ধি হয়েছে খোকা? ছিঃ—

এবারে খোকার নজর পড়িল জগদ্ধাত্রীর উপর। মারব—বলিয়াই বোধ করি তাহার মনে হইল, ভয় দেখাইবার এই মামুলি কথায় তেমন আর জোর বাঁধিতেছে না। সহসা আর এক পন্থা ধরিল, বলিল—দে, আমার রেলগাড়ি দে—

—কাল যে দিলাম।

—সে ছাই গাড়ি। কলের গাড়ি দিবি বলেছিলি, দে এক্ষুণি।

জগদ্ধাত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল—রেলগাড়ি আমি গড়াই নাকি? মেলা থেকে কিনে ত দেবো—

অতএব জগদ্ধাত্রী নিতান্তই বে-কায়দায় পড়িয়া গিয়াছে। দে এক্ষুণি—বলিতে বলিতে উদ্যত হাতে নিতাই তীরবেগে ছুটিয়া আসিল।

ছোটবৌ তাড়া দিয়া উঠিল—খবরদার, ছুঁয়ে দিও না ওঁকে। শুদ্ধ কাপড়চোপড় পরে মঠবাড়ি যাচ্ছেন—

নিতাই ছুঁইল না। থুঃ থুঃ—করিয়া মুখের সমুদয় চিবানো পেয়ারা জগদ্ধাত্রীর গায়ে চালিয়া দিল। দিয়াই পলাইতেছিল, জগদ্ধাত্রী ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস-ঠাস করিয়া পিঠে দিল দুই চাপড়। প্রবল চিৎকারে নিতাই আছড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

তরঙ্গিণী কোথায় ছিল, হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল। সকলের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনাবাক্যে সে ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া নিতুর কান্না থামিল। তাহাকেই সম্বোধন করিয়া তরঙ্গিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিল—আর যদি কারও কাছে যাস হতভাগা ছেলে, মেরে একেবারে খুন করে ফেলব। শত্তুরের হাতে ছেলে ফেলে দিয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে—

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। কোন দিক দিয়া কোন সাড়া আসিল না দেখিয়া এবারে তরঙ্গিণী ঘরের আড়া-খুঁটিগুলিকেই শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—মিছরির ছুরি! গ্রামসুদ্ধ মানুষ ডাকাডাকি, কি সমাচার?—না জমিদারি-তালুকদারি সমস্ত ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, তার সালিশি হবে। আবার ইদিকে বাড়ির ভিতরে এসে কত রঙ্গরস! ছেলে খুন করার মতলব—ধনে, প্রাণে মারতে এসেছে আমাদের।

মেজবৌ কখন উঠিয়া গিয়াছে। ছোটবৌ মুখ লাল করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী কথা কহিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নাই, বলিল—ছেলেকে অত আদর দিও না বৌ। একটু শাসন করলে ছেলে খুন হয়ে যায় না—

ঘরের মধ্য হইতে জবাব আসিল—পেটের ছেলেকে শাসন করুক গিয়ে লোকে—

ম্লান হাসি হাসিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—তা যে নেই।

মুখের কথা কাড়িয়া তরঙ্গিণী বলিতে লাগিল—ভগবান দেয় নি। সে অন্তর্যামী—সব বোঝে, খুনে মেয়েমানুষের কোলে দেবে কেন? যে যেখানে ছিল সব শেষ করে এখন আমার সংসারে নজর দিতে এসেছে—

—কি, কি বললি? জগদ্ধাত্রী বাঘিনীর মতো উঠিয়া চক্ষের পলকে উঠানের এই প্রান্ত অবধি আগাইয়া আসিল। বলিতে লাগিল—বুঝি গো বুঝি, খাওয়া জিনিষ উগরে দিতে বড্ড লাগে। কিন্তু এত দেমাক? দর্পহারী আছেন, এখনও চন্দ্রস্থয্যি আছে। আমি আর কি বলব!

গলা আটকাইয়া আসিল, সামলাইয়া লইয়া বোধ করি যাহাতে সেই দর্পহারীর কান পর্যন্ত পৌছিতে পারে এমনি উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিল—ছেলের দেমাকে মরে যাচ্ছিস, তবু যদি নিজের ছেলে হত! খোঁটা দেবার জিনিষ এ নয় বউ, এক দণ্ডে কার কি হয়ে যায় কেবল ঐ উপর-ওয়ালা জানে—

মুহূর্তের জন্য জগদ্ধাত্রীর বোধ করি একটি অতি চরমক্ষণের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিয়ে তখন তার খুব বেশি দিন হয় নাই। নূতন গিন্নীপনার আনন্দে লজ্জায় দিনগুলি উড়িয়া চলিয়া যায়। জগদ্ধাত্রী ছ-মাসের অন্তঃসত্ত্বা। স্বামী কণ্ট্রাক্টরি কাজ করিতেন, দুপুরের পর দিব্য পান চিবাইতে চিবাইতে ভালমানুষ বাহির হইয়া গেলেন, ঘণ্টা দুই পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। সর্বাঙ্গ রক্তে ভাসিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, এক উঁচু পাঁচিলের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণটুকু ধুকধুক করিতেছিল, বাড়ি আনিবার পথে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রী আছাড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। একবার জ্ঞান হয়, আবার তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরের দিন প্রসব করিল অপরিণত একটি রক্তপিণ্ড, মানব-শিশু বলিয়া তাহাকে চিনিবার জো নাই। মিছা

কথা নয়,—মিছা কথা বলে নাই তরঙ্গিণী। মা হইয়া নিজের শিশুকে সত্যই সে খুন করিয়াছে। তারপর কতদিন গিয়াছে, এখনও মাঝে মাঝে সেই সব মনে পড়িয়া দৃষ্টি তাহার ঝাপসা হইয়া আসে।

বাহিরে তখন অনেকগুলি কণ্ঠ চিৎকারের যেন প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে। হৃদয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া ডাকিল—দিদি, আসুন তো শিগ্‌গির। তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে বলিতে চলিল—আচ্ছা এক মজা হয়েছে। বিপিন চক্কোত্তি-টক্কোত্তি সবাই হাজির, তারই মধ্যে ক্ষেত্তোর-দা আপনাকে সাক্ষি মেনে বসেছেন। এইবার আপনি সব কথা বলুন গিয়ে—

ক্লান্তি জগদ্ধাত্রীর মুখের উপর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। করুণকণ্ঠে বলিল—ওর মধ্যে আর আমাকে কেন? আমি বাইরের দিকে থাকব। তুমি যা হয় কর গিয়ে হৃদয়, ঐ গণ্ডগোলে আমাকে টেনো না—

—সে কি? হৃদয় আশ্চর্য হইয়া কহিল—গণ্ডগোল কোথায়? এত ঠিকঠাক করে শেষকালে পিছিয়ে গেলে চলে? বলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। বলিতে লাগিল—আমার দিদি এক কথা। ষাটটি টাকা দেবো, নগদই দেবো,—কাল চান কালই পাবেন। আপনি গিয়েই ঘর মেরামত আরম্ভ করতে পারবেন। কিন্তু দশজনের মোকাবেলা জমিটা নির্গোল হওয়া চাই—

একটু চুপ থাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া আবার বলিল—বাপের বাড়ির গ্রাম—কার সামনে বেরুতে লজ্জা হচ্ছে ঠিক করে বলুন ত? ক্ষেত্তোর-দা রয়েছেন বলে বুঝি—

তীক্ষ্ণ স্বরে জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিল—আমি কাউকে গ্রাহ্য করি নে, চলো—

গ্রামের অনেকেই আসিয়াছেন। বিপিন চক্রবর্তী মহাশয় বয়সে সকলের বড়; এতক্ষণ যা কথাবার্তা হইয়াছে, জগদ্ধাত্রীকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। মাঝখানে হৃদয় বাধা দিয়া বলিল—ও সেটেলমেন্টের কথা ধরবেন না আপনারা, ট্যাঁকে দু-পয়সা গুঁজতে পারলে 'হয়'কে স্বচ্ছন্দে 'নয়' করা যায়। সহায়রাম জেঠার বসতবাড়ি ছিল সিদ্ধ নিষ্কর। তিনি মারা যাবার পর ঘরদোর পড়ে গেল, ভিটের উপর একহাঁটু জঙ্গল হয়ে পড়ল। তারপর ক'বছর পরে ক্ষেত্তোর-দা ওঁর উত্তর-বাগের বেড়াটা ঘুরিয়ে ও-জমিটাও ঘিরে ফেললেন। আমি বললাম—ক্ষেত্তোর-দা, কাণ্ডটা কি? জবাব দিলেন—ওরা দেশে-ঘরে এসে যখন দাবি করবে তখন ছেড়ে দেব; পোড়ো জায়গাটুকু বেড়া দিয়ে নিলে ওদিকে মজা-দীঘি পড়ে যায়, দু-পাশে আর বেড়া বাঁধতে হয় না, অনেক খরচের আসান হয়।...তখন কেউ আর বাদী হয় নি, এসে ঝগড়া করতে কার মাথাব্যথা পড়েছে? এবার জগদ্ধাত্রী দিদি তাঁর পৈতৃক ভিটে চাচ্ছেন—অনাথা বেওয়া মানুষ, আপনারা দশজনে বিচার করুন—

ক্ষেত্রনাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন—মিথ্যে কথা!

বিপিন চক্রবর্তী বলিলেন—তা হলে তুমি যা বলবে, বলো ক্ষেত্তোর নাথ—

ক্ষেত্রনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—আমি কিছু বলব না চক্কোত্তি মশায়, আমি ত বলেছি—আমি এক কথাও বলব না। ও-ই বলুক। উত্তেজনার বশে স্বর কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন—হৃদয়ের সঙ্গে যোগ-সাজস করে বড় আজ বাদী হতে এসেছে, ও বলুক আজ আপনাদের দশজনের সামনে—ওর বিয়ের পরদিন, ফাল্গুন মাসের সতের তারিখ... তারিখটা পর্যন্ত আজো মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে—কুলীন বরযাত্রীরা বেঁকে বসল, মর্যাদা না পেলে খাওয়া-দাওয়া করবে না। সহায়রাম খুড়ো

চোখে অন্ধকার দেখিলেন—সেই সময় কে রক্ষে করল? বলো জগদ্ধাত্রী, বলো—মনে আছে সে সব দিনের কথা? আমার মা'র বাজুবন্ধ কেশব দত্তর কাছে বন্ধক দিয়ে চল্লিশ টাকা এনে দিলাম, সহায়রাম খুড়ো আমার হাতখানা ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, মেয়ে আমার রাজার ঘরে গেল—সে কিছু নিতে-থুতে আসবে না। তোমার এ টাকা শোধ করতে পারি ভাল, না পারি জমাজমি বাড়ি-ঘর-দোর সমস্ত তোমার। থাকত যদি কেশব দত্ত বেঁচে, সে বলত; এখন ও-ই বলুক—

জগদ্ধাত্রী আগড়ের বাঁশ ধরিয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—বলো সব। সহায়রাম কাকা মাদুরে বসে, তুমি খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলে লাল বেনারসি পরে। অনেক বরযাত্রী বউ দেখতে এলো সেই সময়—বলো তুমি, সে সত্যি নয়? আমি এককথায় সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি।

জগদ্ধাত্রী কথা বলিল না, তেমনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব দিল হৃদয়। বলিল—কিন্তু আমরা শুনেছি, সে টাকা শোধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া চল্লিশ টাকায় অতটা নিষ্কর জমি হতে পারে না।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—তোমরা স্বপ্নে শুনেছ। চল্লিশ টাকা কি বলছ—কেশব দত্তর কাছ থেকে বন্ধক ছাড়িয়েছিলাম তার ডবল আশি টাকা দিয়ে। তার উপর আরও কত বছর হয়ে গেল, সুদের সুদ তস্য সুদ ধরব না? কত টাকা হয় তা হলে? সিকি পয়সা রেয়াত দিচ্ছি নে।

একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন—আজ হৃদয় তোমার বড় আপনার হল জগদ্ধাত্রী, কোথায় ছিল সেদিন ওরা? ওর বাপ বরদাকান্ত ত সেই-খানেই ছিলেন, চল্লিশটা পয়সা দিয়ে কোন সুহৃৎ সেদিন সাহায্য করে নি।

জগদ্ধাত্রী একবার হৃদয়ের মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—বাবা কেশব দত্তর টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন।

অগ্নিদৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—তোমার কাছে টেলিগ্রাফ হয়েছিল বুঝি ?

—বাবা চিঠি লিখেছিলেন।

—দেখাও চিঠি।

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—এত দিনের চিঠি···তাই কি থাকে ?

ক্ষেত্রনাথ অধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—থাকে, থাকে—সত্যি হলে সমস্ত থাকে। আমার কাছে টুকরা কাগজখানি অবধি রয়েছে। পাঠশালে যে দাগা বুলিয়েছ তা পর্যন্ত বের করে দেখাতে পারি। বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এত কথা শিখিয়ে দিতে পেরেছ হৃদয়, আর একখানা চিঠি যেমন-তেমন করে জোগাড় করে রাখতে পার নি ?

হৃদয়ও মহাক্রোধে সমুচিত জবাব দিতে যাইতেছিল, নিবারণ মজুমদার মধ্যবর্তী হইয়া কলহ থামাইয়া দিল। নিবারণ কহিল—মোটের উপর আপনি কিন্তু ঠকে গেলেন চাটুজ্জে মশায়, জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণকে সাক্ষি মেনেছিলেন আপনিই—

ক্ষেত্রনাথ সে কথা আমলেই আনিলেন না। হাতমুখ নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন—কিসের ঠকা ? ও মিথ্যেবাদী, মহাপাপী—যা বলবে তাই হবে নাকি ? আইন-আদালত রয়েছে, মামলা করে নিকগে। আমার আজ চল্লিশ বছরের দখল, গ্রামের সমস্ত লোক দেখছে, মিথ্যে বলে ও ত কেবল নিজের পরকাল খোয়ালে—আমার কি ?

নিবারণ কহিল—গ্রামের সমস্ত লোক আপনার দিকে সাক্ষি দেবে, তা-ই বা কি করে জানলেন ?

ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—দিক ঐ দিকে সাক্ষি—গ্রাহ্য করি নে। এটা কোম্পানির রাজত্ব—আমার দলিল রয়েছে, জরিপের রেকর্ড—তার উপর

মতি বিশ্বেসের মেয়াদি কবলুতি। বিপিন চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—চক্কোত্তি মশায়, আপনি বসুন একটু। যখন পায়ের ধূলো পড়েছে মতি বিশ্বেসের কবুলতিটা একবার দেখে যান।

দ্রুতপায়ে ক্ষেত্রনাথ ঘরে গেলেন।

ঘরের কোণে দেবীদাস রায়ের সিন্দুক বিছানায় বালিসে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন চিহ্ন নজরে পড়ে না।

ক্ষেত্রনাথ দলিলের দুই নম্বর বাক্স খুলিয়া মুহূর্ত মধ্যে কবুলতি লইয়া বাহিরে আসিলেন।

—দেখুন, দেখুন রেজেস্ট্রির তারিখটা হল কোন সাল? হিসেব করে দেখুন, তেত্রিশ বছর হয়ে গেছে। বিশ্বেস জঙ্গল কেটে চাষবাস করবে এই চুক্তিতে মেয়াদি বন্দোবস্ত। আপনি ত বৈষয়িক লোক—বলুন এবার, দখলি-স্বত্ব প্রমাণ হয় কি না?

ফিরিবার পথে বিপিন চক্রবর্তী কহিতে লাগিলেন—আমি বুড়োমানুষ, অনর্থক আমাকে এই সব হাঙ্গামে টেনে আনা। কেঁদে করবি কি মা জগদ্ধাত্রী, ওর আর কোন উপায় নেই। বাঘের মুখ থেকে মানুষ ফেরে, কিন্তু ক্ষেত্তোর চাটুজ্জের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ফিরেছে কেউ কোনো দিন শোনে নি। সেবারে কি হল, ঐ বাসুলডাঙার ভড়দের সঙ্গে? ভড়দের সেজবাবু এত লাফালাফি—হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা—শেষ কালে দেখি ক্ষেত্তোরনাথ ওয়াসিলাতসুদ্ধ আদায় করে নিলে। মনে পড়ছে না হে নিবারণ?

বিকালবেলা ক্ষেত্রনাথ সেই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিলেন। মাদুরের উপর একদল প্রজা-পাটক। গোমস্তা রাখাল হাতি দাখিলা লিখিয়া টাকা লইতেছিল। নানারূপ গল্প হইতেছিল, বিশেষ করিয়া ও-বেলাকার

বিজয়-কাহিনী। রাখাল একবার মুখ তুলিয়া বলিল—ঠাকরুণের শ্বশুর-বাড়ির‌া ত খুব ধনীলোক—

হা—হা করিয়া হাসিয়া ক্ষেত্রনাথ কহিলেন—খুব ধনী—বুঝলে, একেবারে রাজা রাজবল্লভ। আমার ভায়া একদিন গেছলেন সেখানে। তার মুখে রাজবাড়ির বর্ণনা পাওয়া গেল। ভাঙা পাঁচিলের উপর একখানা দোচালা, নারকেল পাতার ছাউনি, অগুন্তি ফুটো। শুয়ে শুয়ে দিব্যি চাঁদের আলো পাওয়া যায়—

রাখাল বলিল—দেশেও ত ওদের বিস্তর জমিজমা ছিল, সে সব কি হয়ে গেল?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—দেনাও ছিল একরাশ। সবাই মরে হেজে গেল, মহাজনেরা আর সবুর করল না। এখন থাকবার মধ্যে ঐ দোচালা অট্টালিকা আর বিঘেখানেক আমবাগান—

বলিতে বলিতে হাসির মধ্যে অকারণেই ক্ষেত্রনাথ রুখিয়া উঠিলেন—কিন্তু আমি এই বলে দিলাম রাখাল, আমার কাছে যেন সিকি পয়সার প্রত্যাশা না করে। তোমাকে হুকুম দেওয়া রইল, উমানাথ হোক আর সে নিজেই হোক যদি এসে প্যানপ্যান করে—সিকিপয়সার সাহায্য না পায়। ঘাড় ধরে বের করে দিও—মিথ্যেবাদী হাড়বজ্জাত সব! ব্যবহারটা কি রকম দেখলে? টাকার অভাব হয়েছে—আগে যদি আসত আমার কাছে, এসে কেঁদে কেটে পড়ত, আমি কি ফেলে দিতে পারতাম, না দিইছি কোনদিন?

রাগের বশে এ কথাটা মনে পড়িল না, জগদ্ধাত্রী সর্বাগ্রে তাঁহাকেই অন্ততঃ পনর-বিশখানা চিঠি লিখিয়াছে।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। বাহিরবাড়ির সীমানায় ঘনসন্নিবিষ্ট তলতা-বাঁশের ঝাড়, তার ওদিকে রাস্তা, রাস্তার পরপারে সহায়রাম রায়ের

সেই পোড়ো ভিটা-বাড়ি। সেখানে আজকাল সরিষাক্ষেত, হলুদবরণ অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ক্রমে দু-একজন করিয়া লোক জমিতে আরম্ভ করিল, কি কথায় উঠিল, বাতাবি লেবুর গল্প, হইতে হইতে আধমুনে কৈলাস। এই কৈলাসটি কে, কোথায় তাঁর জন্ম, সে খবর কেউ জানে না। গল্প আছে, আধ মনের কমে তাঁর পেট ভরিত না। একবার কোন রাজবাড়িতে তিনি অতিথি হন। বিকাল-বেলা সরকার মহাশয়ের কানে গেল, ব্রাহ্মণ তখন পর্যন্ত অভুক্ত। বৃত্তান্ত কি? অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, সিধায় যে আধ-সেরখানেক চাউল দেওয়া হইয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র স্নানাদির পর সে-ক'টি মুখে ফেলিয়া এক ঢোক জল খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, আর কি করিবেন?

সেকালের কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

—কি দিনকালই ছিল! স্বর্গে গেছেন তাঁরা, সে-সব মানুষও আর আসবে না—তেমন হাসি-ফুর্তি আমোদ-আহ্লাদও হবে না কোন দিন! একটা নিশ্বাস চাপিয়া বলিতে লাগিলেন—মনে হয় যেন কালকের কথা, স্পষ্ট চোখের উপর ভাসছে···কিন্তু কোথায় বা কে?

আরও ঘোর হইয়া আসিল। রাখাল কাগজপত্র তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেত্রনাথও আসিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার নজরে ঠেকিল, আবছা মতন একটা লোক অতিশয় মন্থর গমনে রাস্তা পার হইয়া সরিষাক্ষেতে ঢুকিয়া পড়িল।

—দেখ ত, দেখ ত একবার রাখাল,—

অত দূর অবধি স্পষ্ট করিয়া ঠাহর হয় না, তবু যেটুকু নজরে পড়িল তাহাতেই ক্ষেত্রনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—নিশ্চয়

বাইতি-পাড়ার সৈরভী, বদমায়েসের ধাড়ী। ভেবেছ অন্ধকারে বুড়ো দেখতে পাবে না—

কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি লইয়া নিজেই নামিয়া পড়িলেন। সামনে উমানাথকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন—ছুটে যাও, গিয়ে ঐ মাগীর চুলের মুঠো ধরে নিয়ে এসো এখানে। তোলাচ্ছি আমি সর্ষেফুল! হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসো—

উমানাথ বলিল—উনি জগদ্ধাত্রী দিদি। মঠবাড়ির মচ্ছব থেকে ফিরে এলেন এতক্ষণে।

ক্ষেত্রনাথ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—নবদ্বীপের মা-গোঁসাই এলেন। বের করে দিয়ে এসোগে। মামলা করে দখল নিয়ে তারপর যেন আমার ক্ষেতে ঢোকে।

উমানাথ ইতস্তত করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ কিছুকাল গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন—ঘরভেদি বিভীষণেরা সব পিছনে আছ, তা বুঝেছি। গালমন্দ না দিতে পার, গিয়ে ভাল কথায় কি বলা যায় না—দিদি, যা তুলেছ তুলেছ—আর তুলো না। এখন ফুল তুললে সর্ষের ফলন হবে না—

উমানাথ কহিল—উনি সর্ষেফুল তুলছেন না। ভিটের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন—কাঁদাকাটা করছেন না, কিছু না। দুপুর বেলাতেও ঐ রকম আর একবার দেখেছি।

আরও খানিক দাঁড়াইয়া উমানাথ আবার কহিল—আমি বললে কি যাবেন? আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন।

অর্থাৎ স্থূলকথা, তাহার দ্বারা এ-কাজ হইবে না।

ক্ষেত্রনাথ তখন পায়ে পায়ে নিজেই চলিলেন।

সরিষা-ক্ষেতের এক পাশে বড় একটি দেবদারু গাছ, তাহার গোড়ায় আসিয়া দেখিলেন—অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, সেই আলোকে প্রথমটা

নজরে আসিল না—তারপর দেখিলেন,—হলুদ-বরণ ফুলের মধ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা আবছা একটি মূর্তি মাটির উপর একেবারে ডুবিয়া আছে। ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কথা বলিতে হয়, তাই যেন বলিলেন—কে ও? জগো?

জগদ্ধাত্রী চমকিয়া উঠিয়া গভীর কাণ্ঠে ডাকিল—পণ্টুদা!

সেইখানেই ক্ষেত্রনাথ বসিয়া পড়িলেন। দুইজনে চুপচাপ। চল্লিশ বছর পরে মুখোমুখি বসিয়া কিসের নেশায় মন ঝিমাইয়া আসিতেছে।…

হলুদ রঙের ফুলে ভরা জনশূন্য নিস্তব্ধ ক্ষেতের উপরে আলতা-রাঙা পা ফেলিয়া ঘরের লক্ষ্মীরা এঘরে ওঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সামনের আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গলের উপর দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল, দক্ষিণী কারিগরের তৈরি প্রকাণ্ড আটচালা ঘর একখানি। ভিতরে জোড়া-তক্তাপোষে ফরাসের উপর ঝকঝকে সাপের মাথায় হুঁকাদান, তার উপর রূপাবাঁধানো হুঁকা। কলিকায় তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, ও-পাড়ার বৈকুণ্ঠ চাটুজ্জে হাত বাড়াইয়াছেন, কিন্তু হুঁকার নাগাল পান নাই। পাশার দান পড়িতেছে, চিৎকারে ঘর কাঁপিয়া যাইতেছে, ফিরিয়া তাকাইবার ফুরসৎ কাহারও নাই। বৈকুণ্ঠ আসিয়াছেন, কেদারনাথ বরদাকান্ত আসিয়াছেন, আরও কে কে যেন—নজর যায় না। বাড়ির মধ্যে দমাদম ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, নাড়ু-ভাজার গন্ধ—কানে পৈতা জড়ানো ফর্শা রঙ কে খড়ম খটখট করিতে করিতে দীঘির ঘাট হইতে এইদিকে আসিতেছে। কে ডাকিয়া উঠিল—ও জগো, ঘুমুসনি—ওঠ, দুটো খেয়ে নিগে আগে, তারপর—

চুপ, চুপ, চুপ! নিশ্বাসেরও যেন শব্দ না হয়, উহারা কত কি কথা কহিতেছে—ভাল করিয়া শুনিতে দাও…

অনেকক্ষণ পরে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—কেন তখন অত বড় মিথ্যে কথা বললে? হৃদয় তোমার আপনার হল? ঘর সারাবার টাকার দরকার—আমায় যদি আগে ভাল ভাবে বলতে জগো, দু-পাঁচ টাকা দেবার সঙ্গতি আমার কি নেই?

—বড়বাবু! হঠাৎ রাখাল হাতির কণ্ঠস্বর। সে বাড়ি যাইতেছিল, রাস্তা হইতে বলিয়া গেল—আমি চললাম বড়বাবু।

ক্ষেত্রনাথ একবার কাসিয়া চারিদিক তাকাইয়া বলিলেন—এখানটা ছিল পথ, তুমি পাল্কির মধ্যে উঠে বসলে। কপালে সোনার সিঁথিপাটি ছিল—না?

—পথ ওদিকে। এটা বাইরের উঠোন। তুমি সমস্ত ভুলে গেছ। বলিয়া একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া জগদ্ধাত্রী আবার বলিল—কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি পল্টুদা, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে—

ক্ষেত্রনাথ তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন—গিয়েছিলে একরত্তি মেয়ে, ফিরে এলে কি রকম—

—তোমারও কি সে-রকম সব আছে? চুল পেকে গেছে, সামনের দাঁত নেই।

—তা হোক, তা হোক! ক্ষেত্রনাথ ব্যাকুল হইয়া সমস্ত যেন চাপা দিতে চাহেন। বলিলেন—তুই আর পল্টুদা বলে ডাকিস নে জগো, ডাক শুনে চমকে উঠি—গা'র মধ্যে কেমন করে ওঠে যেন। মা মরার পর থেকে ও নাম ভুলে বসে আছি। আজকাল দশ-গ্রামের লোকে আমায় মানে গণে—এর মধ্যে ছেলেবয়সের ঐ ডাক-নাম—না-না-না, ও বলে আর ডাকিস নে, বুঝলি?

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হিমে সরিষা-বন ভিজিয়া গিয়াছে, ঝিঁঝি ডাকিতেছে, চাঁদের আলো

তীক্ষ্ণ ছুরির মতো গাছপালা বিদীর্ণ করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে। নিশুতি গ্রাম ; চারিদিক কি মায়ায় থমকিয়া আছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষেত্রনাথ ডাকিলেন—চলো যাই।

আবার সহসা বলিয়া উঠিলেন—আমার টাকাটার একটা কিনারা করে দে জগদ্ধাত্রী, তোর বাপের ভিটে তোরই থাকুক। শুধু ঐ আশিটা টাকা দে—সুদ-টুদ আর চাইনে—সরষে-কলাই আম-কাঁঠালে যাই হোক কিছু ঘরে ত উঠেছে।

জগদ্ধাত্রী জবাব না দিয়া একটুখানি হাসিল। কয়েক পা গিয়া রাস্তায় পড়িয়া বলিল—ও সব মরুকগে—তুমি আমায় শুধু চারটে টাকা দিতে পার ? দু'টাকা এই আসবার গরুর গাড়ি ভাড়া, আর দু-টাকা ফিরে যাবার।

—তার মানে শেষকালে ত বলে বেড়াবি, জমিটা ফাঁকি দিয়ে নিলে। চিরকালের খোঁটা। ও সব আমি পারব-টারব না বাপু—যা কিছু আছে তোমার, নিয়ে আমায় অব্যাহতি দাও—

নিঃশব্দে আরও কয়েক পা আসিয়া আবার ক্ষেত্রনাথ কথা কহিয়া উঠিলেন—টাকার দরকার থাকে, সিন্দুক বিক্রি কর—দিচ্ছি টাকা… এমনি কে কাকে টাকা দিয়ে থাকে ? সেই যে দেবীদাস রায়ের দরুণ সিন্দুক—সিন্দুক নয়, ক'খানা ভাঙা তক্তা। সেবারে লিখেছিলে, তাই নিয়ে এসে সেই অবধি টানাটানি করে মরছি। চার-টার নয়, ঐ পুরোপুরি পাঁচই নিয়ে নিয়ো—ক্ষতি-লোকসান যা হয় হোকগে, আর কি হবে—

বাড়ি ফিরিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে আভা পা ধুইবার জল দিয়া গেল। তারপর আহ্নিকের আয়োজন

করিতে আসিয়া দেখিল, জলচৌকির উপর তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই আছেন—যেন তাঁহার সম্বিৎ হারাইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ বড় লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি জলের ঘটি টানিয়া লইলেন। বলিলেন—বৌমা, তোমার ছোট মাকে ডাকো দিকি একবার—

তরঙ্গিণী সামনে আসে না, সম্পর্কে বাধে। কবাটের ওধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—সর্বনাশ হয়েছে মা, বিষম সর্বনাশ। সহায়রামের সরষে-বন না ছেড়ে আর উপায় নেই। গ্রামসুদ্ধ সব একজোট। মামলা করবে—আপোষে না দিলে হাজার টাকা খেসারত আদায় করবে—

—করুক গে। এতবড় ভয়ানক কথাটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া তরঙ্গিণী বলিল—আভা, বল তুই—ওসব ঠাকরুণ মিথ্যে করে ভয় দেখিয়েছেন। গ্রামের লোকের বয়ে গেছে।

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—তা বলা যায় না—

—করে করুক। আমরাও দেখব শেষ অবধি। রায় দিয়া তরঙ্গিণী চলিয়া যাইতেছিল, ক্ষেত্রনাথ আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আবার তার সিন্দুক ফিরে চাচ্ছে—

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—সিন্দুক-টিন্দুক নেই। আভা, বলে দে—সে ভেঙে চুরে কবে উই-ইঁদুরের পেটে চলে গেছে।

—কিন্তু কাল যে নিতে আসবে, আমি স্বীকার করে এসেছি।

—কাল? আসুক আগে, তখন দেখা যাবে।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে তরঙ্গিণী চলিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ চুপ হইয়া গেলেন।

সিন্দুকের বৃত্তান্ত হৃদয়ও শুনিল। শুনিয়া নূতন করিয়া সে রুখিয়া উঠিল।

—আপনি নিশ্চয়ই হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলেন—না দিদি ?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিল। হৃদয় বলিতে লাগিল—নইলে ও কি স্বীকার করে ? ও বুড়ো কি কম পাত্তোর ? ওটা আমার চাই। এই একখানা জমি নিয়ে কতদিন আপনার পিছনে ঘুরলাম, কত পয়সা ব্যয় করলাম—সমস্ত গেল ফেঁসে।

ইহারও ভাল মন্দ কোন জবাব না পাইয়া আরও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—পাঁচ টাকা কি—আমি দশ টাকা দেব, আমাকে দিন ঐ সিন্দুক। বাবাকে একদিন না-হক দশকথা শুনিয়ে চোখের সামনে দিয়ে হিড়-হিড় করে ক্ষেত্তোর-দা ঐ সিন্দুক ঘরে তুলেছিল, ও-ই আবার আমি ওর ঘর থেকে টেনে বের করব। কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত শোধ তুলব, তবে আমি বরদাকান্তর বেটা।

পরদিন জগদ্ধাত্রী আসিল। সঙ্গে হৃদয়। বলিল—সিন্দুকটা কি রকম আছে, দেখি একবার। ক্ষেত্রনাথ ঘরের মধ্যে গিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া ভিতরের দিককার দরজা বন্ধ করিলেন, তারপর ঝনাৎ করিয়া চাবি ফেলিয়া দিয়া নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতে লাগিলেন। উমানাথ বালিশ-বিছানা সিন্দুকের উপর হইতে নামাইতে লাগিয়া গেল।

কড় কড়—কড়াৎ। প্রকাণ্ড লোহার তালা কতকাল মরিচা ধরিয়া আছে। গোড়ায় কিছুতে চাবি ঢোকে না, অনেক ঝাঁকাঝাঁকি টানা-টানি করিতে করিতে অবশেষে শিকলের মাথা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িল। উমানাথ ডালা তুলিল।

বিশ্রী ভাপসা গন্ধ। তারপর স্রোতের জলের মতো আরশুলার ঝাঁক বাহির হইতে লাগিল। ভিতরটায় অতলস্পর্শী অন্ধকার।

হৃদয় উঁকি দিয়া বলিল—বাপ রে, তালপাতার আঁস্তাকুড়। ঝেঁটিয়ে ফেল—ঝেঁটিয়ে ফেল। ভিতরের ঐ দু-দিক তলা-মাথা কেমন আছে,

দেখি আগে। বলিয়া ঝাঁটার অভাবে সে নিজেই দুই হাতে একবোঝা ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল, তারপর আর এক বোঝা। তালপাতার পুঁথি, পুঁথির উপর চিত্র-বিচিত্র কাঠের পাটা, ক'খানা তুলোট কাগজের পুঁথিও রহিয়াছে। হাতে তুলিতে সমস্ত টুকরা হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

—রোসো, রোসো, সব যে গেল! উমানাথ ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি হৃদয়কে হঠাইয়া দিল।

হৃদয় বলিল—রাগ কোরো না, একেবারে ফেলে দিই নি। তোমাদের উনুন ধরাতে কাজে লাগবে।

উমানাথ তখন মাটির উপরে ছড়ানো ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরাগুলি সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—এ সব সোনার গুঁড়ো হৃদয়, এ চিনবার ক্ষমতা তোমার নেই। এই সার্বভৌমের পুঁথির স্বাদ নিতে দেশদেশান্তর থেকে কত কত পড়ুয়া ছুটে আসত—

সে কবি লোক। পূর্বগামী মহাজনেরা তাঁহাদের অতি আদরের যে-কথাগুলি উত্তর-পুরুষের জন্য যত্ন করিয়া পুঁথির পাতায় গাঁথিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চক্ষু মুদিয়াছিলেন তাহাদের এই অবহেলার বেদনা তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। বলিল—এই খাতাগুলোয় রয়েছে সহায়রামের গান, ধানক্ষেতে চাষাভূষোর মুখে একদিন শুনে এসো। তারা ভুলে যায় নি।...কিন্তু এটা কি?

একখানি লম্বা আকারের খাতায় গোল গোল মোটা হরপে গঙ্গা-স্তোত্র, দাতাকর্ণ এবং আরও কত কি উপাখ্যান। উমানাথ পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল—এটা আবার কার গান?

জগদ্ধাত্রী হাতে লইয়া দেখিয়া শুনিয়া খাতাটি নিজের কাছে রাখিয়া দিল।

—কি ওটা ?

—বাজে।

উমানাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে সোনা থাকে—বাজে জিনিষ থাকে না দিদি, আপনি চিনতে পারেন নি। দিন আমাকে—দেখব। বলিয়া হাত বাড়াইল।

জগদ্ধাত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—তা বই কি! আমার হাতের লেখার খাতা, আমি চিনি নে ?

ক্ষেত্রনাথকে দেখাইয়া বলিল—এ ওঁর কীর্তি। বলিতে লাগিল—মনে পড়ে পল্টুদা, এই খাতা আর শিশুবোধক তুমি চুরি করে এনে দিয়েছিলে। এই তোমার হাতের লেখা—কি ধ্যাবড়া আর যাচ্ছেতাই। আর এই আমার—কেমন মুক্তোর মতো দেখ দিকি! সকালবেলা উনি তিন-চার ছত্র করে লিখে দিয়ে যেতেন—পাঠশালে সমস্ত দিন ধরে যত মার খেতেন, বাড়ি এসে তার শোধ তুলতেন আমার উপর—সমস্ত দিন ধরে ঐ ভয়ে বসে বসে দাগা বুলোতাম। কত কষ্টই যে দিয়েছ তুমি—

পুঁথিপত্র নামাইয়া সিন্দুক ক্রমশ খালি হইতে লাগিল। মাঝের তক্তা ভাঙিয়া গিয়াছে, সমস্ত জোড় আলগা হইয়া গিয়াছে, তলাটাও একদম নাই। দেখিয়া শুনিয়া হৃদয়ের প্রতিশোধের উষ্ণতাও ক্রমশ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। টাকা দিয়া এই বস্তু কিনিয়া বাড়ির পথেই ত অর্ধেক গুঁড়া হইয়া যাইবে। বলিল—ইস, একদম গিয়েছে যে!

জগদ্ধাত্রীও বুঝিল, ইহা কায়দায় ফেলিয়া দাম কমাইবার চেষ্টা। সভয়ে কহিল—নেবে না নাকি? না-ই যদি নেবে, এই টানা-হেঁচড়ার দরকার ছিল কি ?

হৃদয় বলিতে লাগিল—নেব না বলছে কে? কিন্তু আগে ত জানতাম না, এই দশা। দশ টাকা আমি দিতে পারব না।

ক্ষেত্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তার আগেই উমানাথ বলিয়া উঠিল—আমি রাখব দিদি, আমি দশ টাকা দেব। সরুন, পুঁথি-পত্তোর তুলে ফেলি, গানের খাতা তুলে ফেলি—বলিয়া সহায়রামের গানের খাতা কপালে ঠেকাইয়া সে সিন্দুকে তুলিল। বলিতে লাগিল—বরাত-ক্রমে ঘরে এসেছে ত এমন সিন্দুক জীবন থাকতে ছাড়ছি নে। দশ টাকা চান, তাই দেওয়া যাবে। সরো হৃদয়, তোমার পিছনে ওদিকটায় আরও যে কি কি সব পুঁথি রয়েছে…

সমস্ত সাজাইয়া তুলিয়া উমানাথ সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিল। ক্ষেত্র-নাথের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর জগদ্ধাত্রীর হাতের দিকে নজর পড়িতে বলিল—ওটা আবার কি —সেই হাতের লেখার খাতা ?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—এটা ত বিক্রি করি নি…আচ্ছা, কত টাকা দিতে পার এটার দাম ? এক পয়সাও না ? তাই বই কি ! লাখ টাকা—বুঝলে, তারও বেশি। তারপর বলিল—যা-ই হোক, টাকা দশটা কালকে দিয়ে দিও উমানাথ, খুব সকালে রওনা হয়ে যাব। হৃদয় লক্ষ্মী ভাই, আজ বিকেলের দিকে একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে রেখো—

হৃদয় বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—আমি পারব না। ক'দিন ধরে এই করে করে কাজকম হচ্ছে না কিছু। আজ আমার আদায়ে বেরুতে হবে। আপনি আর কাউকে বলুন।

ক্ষেত্রনাথ এতক্ষণ সকলের পিছনে নির্বাক পাথরের মতো দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন, এইবার কথা কহিয়া উঠিলেন। বলিলেন—তুমি ভেবো না জগো, গাড়ি আমি ঠিক করে দেব। আর এত বেলায় হৃদয়ের বাড়ি অদ্দুর না-ই গেলে ! তরঙ্গিণীর আপ্যায়নের কথা ভাবিয়া একবার একটু ইতস্তত করিলেন, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—

আজ থাক আমার বাড়ি, কাল এখান থেকে অমনি চলে যেও। হৃদয় বরঞ্চ একসময় কাউকে দিয়ে তোমার জিনিষপত্তোর যা আছে পাঠিয়ে দেবে।

—তা দেবো—বলিয়া ব্যঙ্গভরা হাসি হাসিয়া হৃদয় বলিল—অঢেল জিনিষপত্তোর! ফুটো ঘটি আর থান দুই কাঁথা—দেবো পাঠিয়ে বিকেল বেলা।

সকলে চলিয়া গেল, রহিলেন কেবল ক্ষেত্রনাথ ও জগদ্ধাত্রী। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—জগো, দিয়ে দে আশি টাকা, আমি তোর জিনিষপত্তোর, বাপের ভিটে—সমস্ত ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ত বাঁচি তা হলে।

জগদ্ধাত্রী হাসিল।

—না পারিস···আচ্ছা, টাকা দিস এর পর। সত্যি তুই চাস? একটু থামিয়া আবার বলিলেন—সত্যি সত্যি চাস কিনা তাই বল।

জগদ্ধাত্রী একটু চুপ থাকিয়া বলিল—ও তোমারই থাক। তুমি বরঞ্চ মাঝে মাঝে দু-এক টাকা করে পাঠিয়ে দিও আমায়। জায়গা-জমি ত পেটে খাওয়া যায় না!

পরদিন খুব ভোরে গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। মেজবৌ ছোটবৌ অনেক আগেই উঠিয়াছে। বলিল—ভুলে যাবেন না মা, আসবেন আবার।

আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছিয়া জগদ্ধাত্রী বলিল—সোনার রাজ্যি তোদের মা, ছেড়ে যেতে মন আমার চাচ্ছে না।

ক্ষেত্রনাথ আসিয়া ডাকিলেন—শোনো—

তাহাকে একান্তে ডাকিয়া পাঁচটি টাকা হাতে দিলেন। বলিলেন—সিন্দুকের দাম।

জগদ্ধাত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিল—এ কি? দশ টাকার কথা ছিল যে! উমানাথ কোথায়?

সে ত তারপর থেকে নিরুদ্দেশ। মঠবাড়িতে গেছে, সেখানেই মালসা-ভোগ হচ্ছে আর কি। তার কথায় কি হবে? দরদস্তুরের সে জানে কি? নেহাৎ বলে ফেলেছে বলেই—নইলে ভাঙা সিন্দুক আর কি কাজে লাগবে বলো? ইচ্ছে হলে তোমার জিনিষ নিয়ে যেতে পার।

জগদ্ধাত্রী ভাবিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ প্রশ্ন করিল—কি বলো? যাবে নিয়ে? ঐ রকম বেকায়দা জিনিষ গরুর গাড়িতে যাবে বলে ত বোধ হয় না, অন্য রকম ব্যবস্থা করতে হয় তা হলে। খরচও ঢের—

জগদ্ধাত্রী বলিল—দাও, ও-ই দাও—তোমার যা খুশি…আসা-যাওয়ার ভাড়া গেল চার—হাতে থাকল এক টাকা। তাই ভাল। বলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া হাত পাতিল।

ক্ষেত্রনাথ টাকা দিয়া একটু ওদিকে যাইতে আভা পুনশ্চ আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিল—মা, ছোঁব আপনাকে?

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—মুচির মেয়ে নাকি তুই যে ছুঁলে জাত যাবে?

নত হইয়া সে জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করিল। বলিল—সকালবেলা নেয়ে-টেয়ে নিয়েছেন কিনা তাই বলছিলাম। পায়ের ধুলো নি একটু আপনার যাবার বেলা—

জগদ্ধাত্রী ছোট মেয়ের মতো তাহাকে জড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইল। অশ্রু আর বাধা মানিল না, ঝরঝর করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। চিবুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া আঙুলের অগ্রভাগ চুম্বন করিয়া বলিল—রাজ-রাণী মা তুই আমার—পোড়াকপালীর পায়ে হাত তুই কেন দিবি মা? কেন দিবি, কেন? খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর যেন তন্দ্রা

ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, যাই তবে। তোর শাশুড়ি এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি! নিতাই কোথায় রে—ঘুমুচ্ছে?

—হুঁ।

—আচ্ছা, চললাম। ও পল্টু দা—

ক্ষেত্রনাথ মুখ ফিরাইতে জগদ্ধাত্রী বলিল—আচ্ছা, সেই যে গাড়িটা—মেলার সেই রেলগাড়ি—দাম ঠিক ঠিক কত নেবে বলো ত?

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—বলে ত পাঁচসিকে। এক টাকার কম দেবে না বোধ হয়—

—এই টাকাটা দিয়ে নিতুকে ওটা কিনে দিও। বলিয়া আঁচলের প্রান্ত হইতে ক্ষেত্রনাথের দেওয়া পাঁচ টাকার একটি টাকা বাহির করিয়া বাঁধানো বোধন-পিড়ির উপর রাখিল। আবার হাসিয়া বলিল—গরুর গাড়ির চার আর রেলগাড়ির এক। লাভে রইল আমার এই খাতাখানা। তবু ত বাপের একটা জিনিষ—

জীর্ণ মটকার থানের আঁচলে সেই কীটদষ্ট বহু পুরাতন দাগা-বুলানো হাতের-লেখার খাতাখানা যত্ন করিয়া জড়াইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রী গাড়িতে গয়া বসিল।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে অসমান গ্রাম্য রাস্তার উপর দিয়া গাড়ি চলিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ কি রকমে গরুর কাঁধের ফাঁস খুলিয়া গিয়া গাড়ি একটুখানি থামিল। অল্প দূরেই সহায়রাম রায়ের পরিত্যক্ত ভিটার উপর শিশির-স্নাত হলুদবরণ সরিষা-ফুলের সমুদ্র। প্রভাতের শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, বাক্স হইতে আরও পাঁচটি টাকা লইলেন। এক মুহূর্ত ইতস্তত করিলেন,

তারপর গাড়ির পিছে পিছে এক রকম ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া থামাইয়া টাকা কয়টি জগদ্ধাত্রীর হাতে দিলেন।

—এই নাও। চল ত? ঘর সারাতে হয়, যা করতে হয়, করো গিয়ে—আমি আর কিছু জানি নে। যেন একজন কাহার উপর বড় অভিমান করিয়া বিদায় হইয়া যাইতেছে—নিজের মান বজায় রাখিতে হইবে, তাহাকেও ঠাণ্ডা করিতে হইবে, এমনি একটা ভাব। ক্ষেত্রনাথ বলিতে লাগিলেন—ভায়া আমার বেশ মানুষ। দশ টাকা হুকুম করে নিজে ত গা ঢাকা দিয়েছেন, এখন মর শালা তুই টাকার জোগাড় করে।

অপর পক্ষ অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ গাড়োয়ানের উপরেই হাঁক দিলেন—চালা, চালা—বেলা বাড়ছে না? থেমে রইলি কেন?

জগদ্ধাত্রী বলিল—আর কতদূর যাবে পল্টু দা, ফেরো এবার।

তাই ত! বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চমকিয়া মুখ তুলিলেন। তারপর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—না হয় যাবো তোর বাড়ি অবধি। একটা দুটো দিন খেতে দিবি নে?

উঠে এসো, গাড়িতে জায়গা দেব। গাড়োয়ানকে বলিয়া জগদ্ধাত্রী গাড়ি দাঁড় করাইল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি যাবে আমার বাড়ি? হা রে আমার কপাল! সেই জঙ্গলরাজ্যের মধ্যে যাবে আনন্দের হাট ফেলে?

ক্ষেত্রনাথ নিরাপত্তিতে গাড়িতে উঠিলেন, আবার গাড়ি চলিতে লাগিল। সামনে ধূলা উড়াইয়া আর একটা গরুর গাড়ি চলিতেছে। জগদ্ধাত্রী পুনশ্চ প্রশ্ন করিল—সত্যি, চললে কোথায়? এদিকে তাগাদা-পত্তোর আছে বুঝি?

সে কথায় কান না দিয়া হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ উচ্ছ্বসিত গলায় হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, কতকাল—কতকাল পরে গলার উপর হইতে কিসের একটা বাঁধন খসিয়া গিয়াছে, বুক ভরিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—দেখ, দেখ—ঐ গাড়ির ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কি ভাবছে বলো ত?

জগদ্ধাত্রীর মুখেও মৃদু হাসির আভা খেলিয়া গেল। বলিল—কি ভাবছে ওরাই জানে—

—আচ্ছা, এই যদি বিশ-পঞ্চাশ বছর আগে হত—এমনি ভাবে যেতাম, লোকে ঠিক হাসাহাসি করত,—না? কি ভাবত বল দিকি?

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—তা হাসত। ভাবত, তোমার ঠ্যাং ভেঙেছে। পায়ে বল থাকতে শখ করে কেউ কি আর গরুর গাড়িতে চড়ে?

—তোমার মুণ্ডু।

—তবে?

—সেই সময় এদেশ-সেদেশ কত কি রটে গিয়েছিল, মনে আছে?

জগদ্ধাত্রী ভালমানুষের মতো সায় দিল—তা আছে। একবার রটেছিল, পানে পোকা। হাজার হাজার মানুষ নাকি পান খেয়ে মরে গেছে। গাঁয়ের কেউ আর পান খায় না। বারুইরা বাবার কাছে এসে কাঁদে, গোছা গোছা পান দিয়ে যাচ্ছে, পয়সা লাগবে না—বলে, বারোয়ারির চাঁদা যা ধরবে তাই দেবো—তোমরা একবার একটা পান মুখে দিয়ে দেখ।

অধীর কণ্ঠে ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—তুমি গাধা।

জগদ্ধাত্রী বলিল—তুমি নামো দিকি—শিগগির গাড়ি থেকে নেমে যাও। আমার ভয় করছে। গালাগালির পরে আবার হয়ত সেইরকম ঠেঙানি শুরু হবে—

ক্ষেত্রনাথ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—হবেই ত। তুই সমস্ত ভুলে যাস। কথা উঠেছিল না, আমাদের বিয়ে হবে?

জগদ্ধাত্রী ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিল—তা হবে হয়ত। কত সম্বন্ধ হয়েছিল, সব কি মনে থাকে?

—মনে থাকে না? মাথায় তোর গোবর-পোরা, তাই মনে থাকে না। হঠাৎ মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, মিটি-মিটি হাসি। বলিলেন—সমস্ত মনে আছে তোমার। দুষ্টুমি হচ্ছে। চিরকাল জানি তোমাকে। তবে শোন্ একটা কথা—

ক্ষেত্রনাথ অকারণে চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া গলা নিচু করিয়া বলিতে লাগিলেন—কেউ জানে না, কোন দিন কাউকে বলিনি। যেদিন তোকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেল, আমি কেঁদেছিলাম। বাঁশঝাড়টার ঐখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তোর পাল্কি খেয়ায় তুলল। কি রকম হয়ে গেল মনটা—খানিক পরে আপনি চোখে জল গড়িয়ে এলো। ঐখানে উপুড় হয়ে পড়ে কত কাঁদলাম—

শ্রোতার মুখের হাসি নিভিয়া গেল। এক মুহূর্ত চুপ থাকিয়া গম্ভীর বিরক্ত কণ্ঠে জগদ্ধাত্রী বলিল—তুমি এই শোনাতে গাড়িতে উঠে এলে নাকি? তিন কাল কেটে গেছে, একজন বিধবা মানুষের সামনে ঐ সব বলতে মুখে বাধে না?

ক্ষেত্রনাথ ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভারি লজ্জা হইল। সহসা কথা জোগাইয়া উঠিল না। বলিলেন—লজ্জা নয়···হাসির কথা, শুধু একটা হাসির কথা জগো, একটা সেকেলে কথা। কত কথাই ত মানুষে বলে—

জগদ্ধাত্রীর চোখে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল। অলক্ষ্যে মুছিয়া সে বলিয়া উঠিল—হোক কথা। আমি এক্ষুনি গ্রামে ফিরে তোমার সমস্ত কীর্তি রাষ্ট্র করে দেব।

কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ক্ষেত্রনাথ মুখের দিকে তাকাইলেন, চোখ দু'টি তার ছল-ছল করিতেছে। হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—তা দিগে যা। তখনকার মানুষ কে আছে, আর কে-ই বা বুঝবে? এক্ষুণি আনন্দের হাটের কথা বলছিলি না জগো,—আমাদের এখন ভাঙা হাট, আমাদের হাটের মেলা ঐ জমছে ঐদিকে।

বলিয়া আকাশের দিকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ চুপ হইয়া গেলেন।

নদীর তীরে খেয়াঘাটে গাড়ি থামিল। মঠবাড়ি এখান হইতে বেশি পথ নয়, সেখানে এখনও প্রবল খোলের আওয়াজ। খেয়ানৌকা ঘাটে পড়িয়া আছে, কিন্তু মাঝি নিরুদ্দেশ। জমার খেয়া নয়, অতএব ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পারার্থীরা আসিয়া মাঝির ঘরের দরজায় ধন্না দিয়া পড়ে, মেজাজ যেদিন তার ভাল থাকে ঘণ্টাখানেকের বেশি ডাকাডাকি করিতে হয় না। গাড়োয়ান মাঝির খোঁজে চলিয়া গেল।

দু'জনে খেয়াঘাটের কিনারে গিয়া বসিল।

শীতের নদীজলে ধোঁয়ার মতো কুয়াসা উড়িতেছে। তখন ভরা জোয়ার, কল-কল বেগে জল ছুটিয়া আসিয়া পাড়ের উপর প্রহৃত হইতেছে। একটু দূরে মহাকালের মতো মহাবৃদ্ধ একটি অশ্বত্থ গাছ শত-সহস্র ঝুরি নামাইয়া অনেকখানি জায়গা জাপটাইয়া বসিয়া আছে। আগের গরুর গাড়িখানাও গাছের তলায় আনিয়া রাখিয়াছে। ছইএর মধ্যে ফুটফুটে একটি বউ, বউটির মুখের উপর অশ্রুর ছাপ। চালার উপর বাহিরে সুন্দর একটি যুবা বধূর মুখের কাছে মুখ লইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া নাড়িয়া কত কি বলিতেছে। অশ্রু-চোখে বৌটি হাসিয়া উঠিল।

দু'জনে সেই তরুণ-তরুণীকে দেখিল, কুয়াসাচ্ছন্ন নদীস্রোতের দিকে দেখিল, চারিদিকের নিস্তব্ধ প্রান্তর পথ-ঘাটের দিকে চাহিয়া চাহিয়া

দেখিতে লাগিল। হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—দশা তোরও যা, আমারও তাই আমারও কেউ নেই—তোরও না।

জগদ্ধাত্রী গাঢ় স্বরে বলিল—ওরা কেউ যত্ন করে না বুঝি!

ক্ষেত্রনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—মানুষের দোষ নয় রে, বয়সের দোষ। কিন্তু সে যাক, তুই রাগিস নি ত? বল্ জগো, সত্যি করে বল্—

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিল—না। আমি কি সেই জগদ্ধাত্রী আছি না তুমি সেই পল্টুদা? আমরা দুই বুড়োবুড়ি আর কাদের গল্প বলছিলাম।

দু'জনেই হাসিতে লাগিল।

গাড়োয়ান ফিরিয়া খবর দিল, মাঝি বাড়িতেও নাই—রাত্রে মঠবাড়িতে গান শুনিতে গিয়াছিল, এখনও ফিরে নাই।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন—আমি যাই—বেটাকে তাড়া না দিলে কি উঠবে?

জগদ্ধাত্রীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তুইও যাবি নাকি?

মঠবাড়িতে গান তখন বড় জমিয়াছে। অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন, শেষরাত্রি হইতে গান জুড়িয়াছে। কাল বালক-সঙ্কীর্তনের দল আসিয়া পড়িয়াছে, কালও সমস্ত দিন গান হইয়াছে; সেই জন্য উমানাথের আর বাড়ি যাওয়া হয় নাই। জগদ্ধাত্রী চলিয়া যাইবে তাহা মনে ছিল, তবু যাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অবধি চুপ করিয়া গান শুনিয়া, তারপর সে থাকিতে পারে নাই, নিজেই দলের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গান ভাঙিতে বেলা গড়াইয়া গেল, তখন আর বাড়ি-ঘরের কথা উমানাথের মনে নাই। বৈষ্ণব-সেবার ডাক আসিল, উমানাথ তখনও মনে মনে সুর ভাঁজিতেছে।

সেই প্রথম দিনের দলটির কর্তা আসিয়া মনে করাইয়া দিল—ছোট

চাটুজ্জে মশায়, মনে আছে ত আমাদের মাথুর পালাটা ঠিক করে দেবার কথা ?

কীর্তনীয়াদের থাকিবার জন্য খড়ে-ছাওয়া প্রকাণ্ড মণ্ডপ। তাহার একদিকে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কেরোসিনের ডিবাটা সরাইয়া লইয়া উমানাথ সেখানে বসিল। খেরো-বাঁধা খাতা বাহির হইল, আর বাহির হইল সহায়রামের পুরাণো গানের খাতা—দেবীদাস রায়ের সিন্দুকে যাহা পাওয়া গিয়াছে। খাতার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা পেন্সিল থাকিত।

গুণগুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে উমানাথ পালা লেখা শেষ করিল। রাত্রেই খানিক তালিম দেওয়া হইয়াছে, সকাল হইতে সেই পালা চলিতেছিল—

বৃন্দা বলিতেছে—ওগো অকরুণ শ্যাম, তোমার বিরহে বৃন্দারণ্য শ্মশান হইয়াছে, তোমার পথ চাহিতে চাহিতে গোপীরা অন্ধ হইয়া গেছে, তোমার সোহাগিনী রাই শীর্ণ চতুর্দশী-চাঁদ হইয়া ধুলায় পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণের স্পন্দনটুকু তাহার বুঝি এতদিনে নিঃশেষে থামিয়া গেল…

সহসা শ্রোতারা চাহিয়া দেখিল, ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে মহাশয় একপাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিয়া অবশেষে সকলের মধ্যে বসিয়া পড়িতেছেন। জগদ্ধাত্রীও মেয়েদের মধ্যে বসিয়াছে।

তখন দূতীকে কৃষ্ণ অভয় দিতেছেন—ভয় করিও না সখি বৃন্দে, আমি ফিরিয়া যাইতেছি। আমার রাইকমল—আমার কৈশোরের সেই বৃন্দাবন—কিছুই মরে নাই। আবার আমি ফিরিয়া যাইব, ম্লান কুসুম শতদল ফুটিয়া উঠিবে…

…পীত ধড়া পরিয়া হাতে মুরলী লইয়া মথুরার রাজা কতকাল—কতযুগ পরে আবার রাখাল-বেশে কৈশোরের বৃন্দাবনে চলিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিল, যমুনা উজান বহিতে লাগিল, হারাণো কালের বাঁশীর ধ্বনি আবার গোকুল-বৃন্দাবন আকুল করিয়া

বাজিতে লাগিল…দুরন্ত কালার ভয়ে ভূমিশয্যা ছাড়িয়া চকিতে শ্রীমতী মুখ ঝাঁপিয়া বসিলেন। আঁচল ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে কত কি কহিতেছেন। কুঞ্জবৃক্ষের শাখাগ্রে কোকিল ডাকিতে লাগিল…

সজল চোখে জগদ্ধাত্রী ক্ষেত্রনাথের দিকে চাহিল। ক্ষেত্রনাথও তাকাইলেন। সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, ক্ষেত্রনাথের চোখে জল। গান শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিবেন, অতিবড় শত্রুও এমন অপবাদ দিবে না। হয়ত চোখের অসুখ, হয়ত চোখে খড়-কুটা পড়িয়াছে…

বেঙ্গল পাবলিসার্স'র পক্ষে প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, মুদ্রণীর পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাণ্ডা, ৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।